গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৪ বর্ষ ২ সংখ্যা ৫ - ১১ আগস্ট, ২০১১ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ২ টাকা

কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকে

৫ আগস্ট ১৯২৩ - ৫ আগস্ট ১৯৭৬

...যাঁরা আজ প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নিযুক্ত রয়েছেন, যাঁরা বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তুলতে চাইছেন, যাঁরা বুর্জোয়া ভাবাদর্শ ও মূল্যবোধের বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রাম চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর, তাঁদের সামনে যে সমস্যাটা আজ সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে, তা হচ্ছে, দেশজোড়া নৈতিকতার সঙ্কট। ঘর ভাঙছে, পরিবার ভাঙছে, ... আপনার ছেলে, আপনি তার কথা ভেবেই সংসার করলেন, রাজনীতি করলেন না, কারণ আপনি মনে করেন, রাজনীতি করে কিছু হবে না; আপনি কত কল্পনা ও স্বপ্ন নিয়ে ছেলেমেয়েকে মানুষ করতে গেলেন। কিন্তু দেখলেন, ছেলেটা হয়ে পড়েছে একরকম, মেয়েটা আর একরকম, একটা রাজকাপুরের চেলা তো আর একটা অন্য কোনও সিনেমা আর্টিস্টের 'ফ্যান' — যে যার মতন। এ'রকম হচ্ছে কেন? ভালবাসায় পর্যন্ত আজ আর সুখ নেই। কত কল্পনা নিয়ে একজনকে হয়ত ভালবেসেছেন, কিন্তু ক্রমেই তা যেন শুকিয়ে যাচ্ছে। কোথায় যেন একটা কিছুর অভাব, কী যেন নেই। এসব কথা আমি বলছি, কারণ আমি আমাদের সমাজটা জানবার চেষ্টা করেছি, এর মানুষগুলোকে বোঝবার চেষ্টা করেছি। অনেকের মুখের দিকে চাইলে মনে হয়, কী যেন একটা চাপা ব্যথা বয়ে বেড়াচ্ছে। এই যে এত 'সিজোফ্রেনিয়ার' প্রাবল্য, এত মানসিক অসুস্থতা মানুষের মধ্যে ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে, এর কারণ কী? আর্থিক প্রাচুর্যের মধ্যেও মানুষ যেন একটা চাপা ব্যথা বয়ে বেড়াচ্ছে — কী যেন নেই। তাই মানুষ যে কোনও উপায়ে পয়সা রোজগারের নেশার মধ্যে, আরাম বিলাসের মধ্যে, নাইট ক্লাবে মদ খেয়ে নার্ভকে কৃত্রিম উপায়ে উত্তেজিত করে — নানাভাবে নিজেকে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করছে। গোটা দেশের মানসিকতায় এক অস্থিরচিত্ততার লক্ষণ। কোথাও শান্তি নেই। এ কি সুস্থতা? আপনাদের মধ্যে অনেকেই ভাবেন, পয়সা হলে আপনাদের অভাব যাবে, শান্তি ফিরে আসবে। কিন্তু একটু লক্ষ করলেই দেখতে পাবেন, হাজার পয়সা রোজগার করেও অনেক পরিবারেই শান্তি নেই। নাহলে পয়সাওয়ালারা রাতভর নাইট ক্লাবে নাচানাচি করে, মদ খেয়ে, অহেতুক নিজেদের নার্ভকে উত্তেজিত করছেন কেন? আসলে ঘরে শান্তি নেই। ... উপরতলার লোকদের অনেকেরই এই অবস্থা — যে উপরতলায় উঠবার জন্য আপনাদের অনেকেরই অন্য সব কিছু ভুলে দিনরাত কী আপ্রাণ চেষ্টা! একটু লক্ষ করলেই আপনাদের চোখে পড়বে, 'ইনটেলেকচুয়ালদের', শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আজকাল ক্রমেই যেন সমাজ সম্পর্কে একটা বীতস্পৃহা বেড়ে যাচ্ছে। মানুষগুলো ক্রমেই আত্মকেন্দ্রিক, আত্মসর্বস্ব ও হামবড়া হয়ে পড়ছে। বুর্জোয়াশ্রেণীর শাশ্বত ও বিশুদ্ধ সৌন্দর্যবোধ ও বিশুদ্ধ সংস্কৃতির প্রভাব ক্রমাগত জন্ম দিয়ে চলেছে জীবনবিমুখ, সংগ্রামবিমুখ, পলায়নী ও কল্পনাবিলাসী মানসিকতার। এরূপ মানসিকতাই তীব্র শ্রেণীসংগ্রাম ও আজকের সমস্যাসঙ্কুল জীবনের জটিল সংগ্রামের মধ্যে পড়ে আজ 'সিজোফ্রেনিক পারসোনালিটি'র জন্ম দিচ্ছে। এইরকম কাল্পনিক ভাবনাধারণা, অর্থাৎ 'ফ্যান্টাসি'র জগতেই আজকাল অনেক যুবক-যুবতী বাস করছে। ডাক্তারদের যদি জিজ্ঞাসা করেন, তাঁরা প্রত্যেকেই বলবেন যে, মানুষের নৈতিকতার মানকে আমরা এমন সুন্দর এবং উন্নত জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছি যে, এত 'প্রগতির' আন্দোলন সত্ত্বেও আজকাল যুবক-যুবতীদের মধ্যে অস্বাভাবিক আচরণ (অ্যাবনর্মালিটি) ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। 'সিজোফ্রেনিক' রোগীর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে; 'স্প্লিট পারসোনালিটি'-র সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। মানুষ আজ যেন বাস্তব থেকে মুখ ফিরিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। সত্যিকারের সুখের জিনিস বলে যা একজন ভাবে, বাস্তবে তা সে দেখতে পায় না। তাই সুখ ও আনন্দের চিন্তা তার হয়ে পড়েছে স্বপ্নের ও কল্পনার বিষয়। আর বাস্তবে জীবনটা হয়ে দাঁড়িয়েছে আনন্দবর্জিত ও রসহীন। এমন হচ্ছে কেন? কারণ, পুরনো ধর্মীয় মূল্যবোধের আবেদন অনেক আগেই এদের মধ্যে নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছে এবং বুর্জোয়া মানবতাবাদী মূল্যবোধও আজ এদের মধ্যে প্রায় নিঃশেষিত। অথচ, সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী মতাদর্শ ও নতুন মূল্যবোধ দেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে ও সমাজজীবনে আজও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে না পারার ফলে আদর্শ ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, তার ফলেই দেশের নৈতিকতার ক্ষেত্রে এই সর্বাত্মক সংকট। (নির্বাচিত রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড)

খুচরো ব্যবসায় বিদেশি পুঁজি কোটি কোটি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে পথে বসাবে

পাইকারি ব্যবসার পর এবার খুচরো ব্যবসাতেও বিদেশি পুঁজির জন্য দরজা খুলে দিতে চলেছে কেন্দ্রের ইউ পি এ সরকার। খুচরো ব্যবসায় বিশ্বের বৃহত্তম মার্কিন বহুজাতিক ওয়ালমার্ট, জার্মান বহুজাতিক মেট্রো, ফরাসি রিটেল বহুজাতিক ক্যারফোরের মতো কোম্পানিগুলি এবার ভারতীয় খুচরো ব্যবসার বাজারেও ঢুকে পড়বে তাদের বিশাল পুঁজি নিয়ে। চাল ডাল তেল নুন মশলাপাতি শাক-সবজি স্টেশনারি খাদ্যদ্রব্য ওষুধ পোশাক প্রভৃতি যাবতীয় প্রতিটি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের খুচরো ব্যবসা করবে তারা। এমনিতেই বিগবাজার, রিলায়েন্স প্রভৃতি দেশীয় বৃহৎ পুঁজিগুলি খুচরো ব্যবসার দখল নিতে শুরু করেছে। তার সাথে এবার যুক্ত হল বিদেশি বৃহৎ পুঁজির মালিকরা। এই রাঘববোয়ালদের সাথে ছোট পুঁজির মালিক ছোট ব্যবসায়ীরা প্রতিযোগিতায় টিকতে পারবে না, ব্যবসা হারিয়ে পথের ভিখারিতে পরিণত হবে। ধীরে ধীরে খুচরো ব্যবসার পুরো নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে এসে গেলে যথেচ্ছ দাম বাড়াবে এই কোম্পানিগুলি। বেশি দাম দিয়ে জিনিস কিনতে বাধ্য হবে সাধারণ মানুষ।

পাইকারি ব্যবসায় ১০০ শতাংশ প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের অনুমোদন কেন্দ্রীয় সরকার আগেই দিয়েছিল। এ বার এক ছাদের তলায় একাধিক ব্র্যান্ডের পণ্যের খুচরো ব্যবসাতেও (মাল্টি ব্র্যান্ড রিটেল) ৫১ শতাংশ পর্যন্ত বিদেশি বিনিয়োগের অনুমোদন দিতে চলেছে সরকার।

ভারতে খুচরো বাজারে ব্যবসার ক্ষেত্র বিরাট। প্রায় ৬০ হাজার কোটি টাকার লেনদেন চলে এই বাজারে। এই আয়তনও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বাজারের অতি সামান্য অংশই এখনও পর্যন্ত বিগবাজার, রিলায়েন্স, আর পি জি গ্রুপ, আই টি সি-র মতো দেশীয় সংগঠিত একচেটিয়া ব্যবসায়ীরা দখলে আনতে পেরেছে। বাকি প্রায় ৯৪ শতাংশ এখনও অসংগঠিত তথা ক্ষুদ্র ও মাঝারি খুচরো ব্যবসায়ীদের দখলে। এই বিরাট লোভনীয় বাজারই বিদেশি বহুজাতিক খুচরো ব্যবসায়ীদের লক্ষ্য।

চারের পাতায় দেখুন

গুজরাটে এ আই ডি এস ও-র দাবি আদায়

বরোদার এম এস ইউনিভার্সিটির ডিন-এর হাতে দাবিপত্র তুলে দিচ্ছেন ছাত্রছাত্রীরা (সংবাদ দুয়ের পাতায়)

ঋণসংকটে জেরবার মার্কিন অর্থনীতি

এই লেখা পাঠকদের হাতে যাওয়ার আগেই আমেরিকার ঋণ সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে নিশ্চিত। তবে এই সমস্যা মার্কিন অর্থনীতির সংকটের যে চেহারা প্রকাশ করে দিল, সেই সংকটের সমাধান হবে না। এতো কেবল মার্কিন অর্থনীতির সংকট নয়, গোটা বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতির গভীর সংকটেরই প্রতিফলন। 'অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি' আর 'গণতন্ত্র' সম্পর্কে 'স্বর্গরাজ্য আমেরিকার' যে ছবিটা আমাদের দেশে পুঁজিবাদের ভক্ত ও সমাজতন্ত্রের বিরোধীরা বর্ণনা করে থাকেন বাস্তবটা যে তা নয়, এই সংকট মার্কিন দেশের সেই মলিন চেহারাটা অনেকটাই উন্মোচন করে দিল।

একথাটা বেশ কিছুকাল ধরেই কাগজে পত্রে অল্পবিস্তর আসছিল যে মার্কিন অর্থনীতি ঋণের উপর দাঁড়িয়ে আছে। ২০০৮ সালে হঠাৎ বিশাল বিশাল আমেরিকান ব্যাঙ্কের দেউলিয়া হওয়ার ঘোষণায় সাধারণ মানুষ চমকে উঠেছিলেন। 'শেয়ার', 'মর্টগেজ', 'সাবপ্রাইম' ইত্যাদি দুর্বোধ্য শব্দ ও ব্যাখা বাদ দিয়েই একথা বুঝতে মানুষের অসুবিধা হয়নি যে, গভীর সংকটের পাঁকে মার্কিন অর্থনীতির চাকা আটকাচ্ছে। এই ব্যাঙ্ক সংকটের পথ ধরেই গোটা বিশ্ব অর্থনীতিকে মন্দার করাল ছায়া গ্রাস করল।

দফায় দফায় আমেরিকা সহ বিশ্বের তাবড় তাবড় পুঁজিবাদী দেশের সরকার নিজ নিজ দেশের জনগণকে আশ্বস্ত করে বলেছে, এবার মন্দা কেটে যাচ্ছে, অর্থনীতিতে তেজি ভাব ফিরে আসছে। তারপরই বলেছেন, আবার মন্দার কবলে অর্থনীতি। মার্কিন অর্থনীতি ক্ষনতার বিচারে বিশ্বের সর্ববৃহৎ। বিশ্বের প্রায় সব দেশ পণ্য রপ্তানির জন্য নির্ভর করে প্রধানত আমেরিকার বাজারের উপর, যেটা দাঁড়িয়ে আছে দেশের মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্তদের ধার করা ডলারের উপর। ভোগ বজায় রাখার জন্য আমেরিকার মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত পরিবারগুলিও ঋণে আকণ্ঠ ডুবে আছে। ফলে ওটাও আয়নির্ভর ক্রয়ক্ষমতাকে ভিত্তি করে স্বাভাবিক বাজার নয়, ঋণনির্ভর বাজার। মন্দার ধাক্কায় মার্কিন অর্থনীতিতে ছাঁটাইয়ের

পাঁচের পাতায় দেখুন

বিপ্লবী কানাইলাল ভট্টাচার্য স্মরণে

বিপ্লবী কানাইলাল ভট্টাচার্য স্মরণে জয়নগর-মজিলপুরে ২৭ জুলাই পদযাত্রা

বোলপুরে শহিদ প্রীতিলতা স্মরণ

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম মহিলা শহিদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের জন্মশতবর্ষে এ আই ডি এস ও এবং এ আই এম এস এসের উদ্যোগে বোলপুর শহরে ২০ জুলাই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট নাগরিক প্রশান্ত চ্যাটার্জীর সভাপতিত্বে এই সভায় প্রীতিলতার সংগ্রামী জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন অধ্যাপক ডঃ বিজয় দলুই, এম এস এসের কমরেড নমিতা দাস এবং এ আই ডি এস ও-র কমরেড ভরত রবিদাস। মাস্টারদার 'বিজয়া' প্রবন্ধটি পাঠ করেন বিশ্বভারতীর তনুশ্রী পাড়িয়া। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কমরেড চৈতালী চক্রবর্তী।

বসিরহাটে মোটরভ্যান চালকদের দাবি আদায়

উত্তর ২৪ পরগণার বসিরহাট শহরের মধ্যে শাক-সব্জি, চাল, মাছ সহ সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আনাগোনা, প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে মুমূর্ষু রোগীকে মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা সহ বহু গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবায় মোটরভ্যানের অপরিহার্যতা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু বাদ সেধেছে কতিপয় ধনী বাসমালিক সহ স্বার্থান্বেষী মহল। তাদের অঙ্গুলিহেলনে ২৭শে জুলাই সন্ধ্যায় অতর্কিতে পুলিশ ৫টি মোটরভ্যান আটক করে থানায় নিয়ে যায়। হাইকোর্টের সাম্প্রতিক রায়ে অবাধে পণ্যসহ মোটরভ্যান চলাচলের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও এ হেন ঘটনায় চালকরা হতবাক হয়ে যান। স্বল্প সময়ের প্রস্তুতিতেই ২৯ জুলাই 'সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নে'র বসিরহাট মহকুমা কমিটির ডাকে বেলা ১২টায় ভ্যাবলা হাইস্কুল সংলগ্ন মাঠে চার শতাধিক মোটরভ্যান চালক সমবেত হয়ে মহকুমা শাসক দপ্তর অভিমুখে মিছিল শুরু করেন। আগাম জানানো সত্ত্বেও মহকুমা শাসকের অনুপস্থিতি ও ডেপুটেশন গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রশাসনের নিস্পৃহতা উপস্থিত সকলের ক্ষোভের পারদ চড়িয়ে দেয়। এসডিও অফিস ক্যাম্পাসের মূল গেট দিয়ে মিছিল ভেতরে ঢুকে পড়ে। সেখানে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন ইউনিয়নের জেলা সম্পাদক জয়ন্ত সাহা, মহকুমা সম্পাদক অজয় বাইন, জেলা সভাপতি পিয়ার আলি, হিঙ্গলগঞ্জ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক নির্মল ঘোষ প্রমুখ। মহকুমা শাসকের দপ্তর থেকে স্মারকলিপি প্রদানের জন্য অনুরোধ আসার পর অজয় বাইনের নেতৃত্বে ৫ জনের প্রতিনিধি দল সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের নিকট স্মারকলিপি প্রদান করেন। গাড়ি ছেড়ে দেওয়া সহ অন্যান্য বিষয়ে আশ্বাস পাওয়ার পর সকলে মিছিল করে এসডিপিও দপ্তর অভিমুখে রওনা দেন।

জেলা সম্পাদক জয়ন্ত সাহার নেতৃত্বে ৪ জনের এক প্রতিনিধি দল এসডিপিও এবং বসিরহাট থানার আই-সি-র সাথে দীর্ঘ আলোচনা করে হাইকোর্টের রায়ের কপিসহ স্মারকলিপি প্রদান করেন। আধিকারিকগণ আটক গাড়িগুলি নিঃশর্তে ছেড়ে দেওয়ার কথা ঘোষণা করলে সমবেত মোটরভ্যান চালকদের মধ্যে খুশির হাওয়া ছড়িয়ে পড়ে।

'পস্কো'র প্রতিবাদে মহিলারা

ওড়িশার ঢিনকিয়া, গোবিন্দপুর, নয়াগাঁও অঞ্চলে বহুজাতিক কোম্পানি পস্কোর স্বার্থে কৃষক উচ্ছেদ করে জমি অধিগ্রহণের প্রতিবাদে সংগ্রামী জনগণকে সংহতি জানাতে ২৫ জুলাই অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের সর্বভারতীয় কমিটি এলাকা পরিদর্শন করে। প্রতিনিধি দলে ছিলেন সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড ছায়া মুখার্জী, সদস্য কমরেড বীণাপাণি দাস, সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড স্বয়ংপ্রভা নায়ক প্রমুখ।

প্রবীণ পার্টি সংগঠকের জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর কলকাতা জেলার পূর্বতন গড়ফা আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক, শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষক আন্দোলনের নেত্রী কমরেড ছায়া গুহ দীর্ঘ অসুস্থতার পর গত ১৪ জুলাই যাদবপুরের কে পি সি হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়েই হাসপাতালে সমবেত হন পার্টিকর্মীরা ও কমরেড ছায়া গুহ'র বহু গুণমুগ্ধ মানুষ। সেখানেই মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক আন্দোলনের নেতা, এস ইউ সি আই (সি) বিধায়ক কমরেড তরুণ নস্কর।

রক্ষণশীল পরিবার ও আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে কমরেড ছায়া গুহ বিদ্যালয় শিক্ষার সুযোগ না পেলেও, শিক্ষালাভের প্রবল আগ্রহ ও মানসিক দৃঢ়তাকে ভিত্তি করে তিনি ও তাঁর বোন নিজেদের চেষ্টায় ম্যাট্রিক পাশ করেন, ও পরবর্তীকালে শিক্ষকতার পেশা গ্রহণ করেন। ঐ সময়ই সাম্যবাদী আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে তদানীন্তন ডেমোক্রেটিক ভ্যানগার্ড ও পরে পরিবর্তিত নাম ওয়ার্কার্স পার্টির সদস্য হিসাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সক্রিয় ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেন। পরবর্তীকালে তিনি এবং আরও বেশ কয়েকজন সদস্য ওয়ার্কার্স পার্টি ত্যাগ করে মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের সংস্পর্শে আসেন এবং দীর্ঘ আলোচনার মধ্য দিয়ে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)ই এ দেশে যথার্থ সাম্যবাদী দল হিসাবে কাজ করছে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে দলে যোগদান করেন। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস সরকারবিরোধী, পরবর্তীকালে সিপিএম সরকারবিরোধী প্রতিটি গণআন্দোলনে যতদিন শারীরিকভাবে সক্ষম ছিলেন সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন। বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। দলের গড়ফা আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক হিসাবে এলাকায় দলের কর্মসূচি রূপায়ণেও তাঁর আন্তরিক ও অক্লান্ত প্রয়াস ছিল। এলাকার মানুষের কাছে তিনি ছিলেন প্রিয় 'ছায়াদি'।

হাসপাতাল থেকে কমরেড ছায়া গুহ'র মরদেহ প্রথমে দলের যাদবপুর কার্যালয়ে ও পরে তাঁর বাসভবনে নিয়ে যাওয়া হয়। রাজ্য কমিটির সদস্য, কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড চিররঞ্জন চক্রবর্তী, রাজ্য কমিটির সদস্য বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সম্পাদক কমরেড কার্তিক সাহা, দলের রাজ্য কমিটি ও জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, দলের জেলা কমিটির সদস্য এবং এ আই ইউ টি ইউ সি-র জেলা সম্পাদক কমরেড শান্তি ঘোষ, জেলা কমিটির সদস্য, যাদবপুর আঞ্চলিক সম্পাদক কমরেড শ্যামল গুহ মজুমদার, কমরেড অনন্যা সেন ও বিভিন্ন গণসংগঠনের আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দ মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। এরপর কেওড়াতলা শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

কমরেড ছায়া গুহ লাল সেলাম

চিকিৎসা পরিষেবা উন্নয়নের দাবিতে ঝালদায় বিক্ষোভ

পুরুলিয়া জেলার ইলু ও মাহাতমার এই দু'টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একসময় ২৪ ঘণ্টা স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়া যেত। কিন্তু 'মাওবাদী' দমনের নামে পুলিশ ক্যাম্প বসিয়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্র দু'টির আউটডোর পরিষেবা লাটে তুলে দেওয়া হয়। আশ্চর্যের বিষয়, পুলিশ ক্যাম্প বসানোর পর থেকে একের পর এক সম্পত্তি চুরি হতে থাকে। প্রতিকারের দাবিতে গণতান্ত্রিক পথে লাগাতার আন্দোলন সত্ত্বেও প্রশাসনের কোনও হেলদোল দেখা যায়নি। তাই ১৮ জুলাই হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির উদ্যোগে তিন শতাধিক গ্রামবাসী ডেপুটেশন দিলেন ঝালদা ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির ঝালদা শাখার সভাপতি বনবিহারী মাহাত, যুগ্মসম্পাদক তপন রজক ও সমীর চৌবে, রানি মাহাত, সুরেখা দর্মন, নীলা মাহাত প্রমুখ।

মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা

৪৫ জন কৃতী ছাত্রছাত্রীকে সংবর্ধনা জানালো এ আই ডি এস ও চেতলা শাখা। ১৭ জুলাই কলকাতার কৈলাশ বিদ্যামন্দিরের ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অংশুমান রায়, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সীমা সরকার প্রমুখ।

গুজরাটে এম এস ইউনিভার্সিটিতে দাবি আদায়

গুজরাটের এম এস ইউনিভার্সিটিতে বি এ প্রথম বর্ষে পাঠ্য বিষয় পরিবর্তন করার অধিকারের দাবিতে এবং সেমেস্টার সিস্টেম ও চয়েস বেসড ক্রেডিট সিস্টেম চালু করার প্রতিবাদে অল ইন্ডিয়া ডি এস ও লাগাতার আন্দোলন গড়ে তোলে। ছাত্রদের স্বাক্ষর সংগ্রহ, ডিন ও উপাচার্যের নিকট স্মারকপত্র প্রদান ও ধরনার পর গত ২৩ জুলাই এ আই ডি এস ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস ফ্যাকাল্টিতে ধর্মঘটের ডাক দেয়। এই আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে আসে নাগরিক সমাজ। বরোদার প্রাক্তন মেয়র রতিলাল দেশাই, ধীরা মিস্ত্রি, তপন দাশগুপ্ত, দীপ্তিবেন ভাট প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সেভ এডুকেশন কমিটির নেতৃত্বে উপাচার্যের সাথে দেখা করে ছাত্রদের দাবি মেনে নিতে অনুরোধ করেন। কর্তৃপক্ষ পাঠ্য বিষয় পরিবর্তন করার অধিকারের দাবি মেনে নিয়েছেন।

সরকারি প্রশ্রয়েই কালো টাকার রমরমা

কালো টাকার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী সাধারণ মানুষের প্রবল ক্ষোভ বুঝেই, সুপ্রিম কোর্টে জনস্বার্থ মামলার শুনানিতে বিচারপতিরা সরকারকে তিরস্কার করতে বাধ্য হন এই বলে যে, কেন সরকার কালো টাকার মালিকদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না, কালো টাকা জমানোর স্বর্গ সুইস ব্যাঙ্কে গচ্ছিত কালো টাকাই বা সরকার উদ্ধার করছে না কেন। সুপ্রিম কোর্টের এই বক্তব্য নিয়ে সংবাদমাধ্যমে বিস্তর লেখালেখি হল এবং সংসদে হৈ চৈও হল। কিন্তু এতে কালো টাকার পাহাড় জমা হওয়ার প্রক্রিয়ায় এতটুকুও আঁচড় পড়ল না। সরকার চাপে পড়ে লোক দেখানো তদন্ত কমিটি গঠন করল। কিন্তু ঐটুকুই। কালো টাকার উদ্ধারে অনেক বক্তৃতা দেওয়া হলেও প্রকৃতপক্ষে এর জন্য কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ সরকার গ্রহণ করেনি।

কালো টাকা কী?

কালো টাকা তৈরি হয় কী ভাবে? আমাদের মতো একটি পুঁজিবাদী দেশে শ্রমিক উৎপাদনের দ্বারা যে মূল্য তৈরি করে তার খুব সামান্য অংশই সে মজুরি/বেতন হিসাবে পান, বাকিটা মুনাফা হিসাবে আত্মসাৎ করে মালিক। সরকার মালিক বা কোম্পানির কাছ থেকে তার আয়ের উপর যে কর বসিয়ে সরকারি রাজস্ব আদায় করে, তাও আসলে মালিকদের আত্মসাৎ করা উদ্বৃত্ত মূল্যের অংশ ছাড়া কিছু নয়। এই ধরনের নানারকম দেয় কর যখন ফাঁকি দিতে আয়ের হিসাবে মালিক/কোম্পানি কারচুপি করে আয় কম দেখায়, তখন হিসাবে না দেখানো আয়ের পরিমাণ কালো হয়ে যায়। সম্পত্তি বিক্রি করে বিক্রিত একটি অংশের অর্থের পরিমাণকে করযোগ্য হিসাবে না দেখিয়ে, বা কোনও কোম্পানি যখন তার ব্যয়ের হিসাবে বেশ কিছু কাল্পনিক খরচ দেখিয়ে তা পকেটস্থ করে বা বেআইনিভাবে ট্যাক্স কম দেয় তখনই তা থেকে কালো টাকা তৈরি হয়। এর কোনও হিসাব সরকারের কাছে থাকে না। ঘুষ, কাটমানি, দালালির টাকা, স্মাগলিং, ড্রাগ ব্যবসা, বেআইনি অস্ত্রের ব্যবসা, কিডন্যাপিং-এর অর্থও কালো টাকা তৈরি করে। ভারতের অনেক বিশেষজ্ঞ পরিষ্কারভাবে দেখিয়েছেন, কীভাবে ড্রাগ ব্যবসার সিন্ডিকেটগুলো, বেআইনি অস্ত্র লেনদেনের কারবারীরা বিভিন্ন ব্যাঙ্ক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের যোগসাজসে বিদেশে পাচার হয়। সব জেনেও সরকার নীরব। কালো টাকা যখন দেশের বাজারে প্রবেশ করে অর্থনীতিতে টাকার পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়ে মুদ্রাস্ফীতি ঘটায়, কালোবাজারিতে, মজুতদারিতে এই টাকা উৎসাহ জোগায়, বেআইনি অর্থ লেনদেনে এই কালো টাকা মদত দেয় এবং এর একটা ভালো অংশ আবার নানা অস্বচ্ছ পদ্ধতিতে বাইরে যায় বেআইনি পথে আরও লাভ করার জন্য।

কালো টাকা সাদা হওয়া এবং আবার কালো টাকায় ফিরে যাওয়া

কালো টাকা কী করে সাদা টাকা হয়? কী করেই বা দেশের বাইরে পাচার হয় এবং দেশের বাজারে তা ফিরে আসে? মূলত দুটি পথে কালো টাকা বিদেশে পাচার হয়। একটি হলো— আভ্যন্তরীণ পথ, অপরটি বাহ্যিক পথ যাকে বলা হয় হাওলা। যেমন একজন ব্যবসায়ী বা শিল্পপতি যদি ১০ কোটি টাকা বেআইনিভাবে আয় করে তাহলে সেই টাকা দেশেরই বিভিন্ন ব্যাঙ্কে নামে, বেনামে, ভুয়ো কোম্পানির নামে অ্যাকাউন্ট খুলে অল্প অল্প পরিমাণে রাখতে শুরু করে। টাকার পরিমাণ অল্প হওয়ায় নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার চোখ এড়িয়ে যায়। এরপর এই টাকা বিদেশের ব্যাঙ্কে গোপনে পাচার করে দেওয়া হয় আবার রপ্তানির সময় পণ্যের পরিমাণ কমিয়ে দেখানো বা আমদানির সময় পণ্যের পরিমাণ বাড়িয়ে দেখানোর মধ্য দিয়েও কালো টাকা বিদেশে পাচার হয়। আর দ্বিতীয় পথ 'হাওলা'য় দেশের কালো টাকার মালিক তার নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা বিশেষ ব্যক্তিকে দেয় যার সাথে হাওলা কার্যকলাপের যোগাযোগ আছে, এবং এই ব্যক্তির সাথে কালো টাকার স্বর্গ বিদেশের হাওলাকারীর যোগাযোগ আছে। যখন এদেশের নির্দিষ্ট ব্যক্তির কাছে অর্থ জমা পড়ে, সেই পরিমাণ অর্থ হাওলা কমিশন বাদ দিয়ে ঐ সমস্ত শিল্পপতির নির্দিষ্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে নানা অস্বচ্ছ পদ্ধতির মাধ্যমে শেষপর্যন্ত জমা পড়ে। এরপর ঐ টাকা ভারতের শেয়ার বাজারে, রিয়েল এস্টেট বা অন্যান্য ব্যবসায় লগ্নি হওয়ার জন্য ফিরে আসে। বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী শিল্পপতিকে এক্ষেত্রে ৩০-৩৫ শতাংশ কর দিতে হত। কিন্তু সেই করের পুরোটাই ফাঁকি দেওয়া হয়। কালো টাকা পাচারের ৭৭.৬ শতাংশই হয়েছে বাণিজ্যে পণ্য ও পরিষেবার সঠিক মূল্য গোপন করার মধ্য দিয়ে। এই প্রক্রিয়া বেড়ে যায় উদারনীতির ফলে। এর জন্য দেশের বাজার খুলে যায়, আমদানি-রপ্তানি বিধি সরল করা হয়। সেই সুযোগে মূল্য কারচুপি করে স্রোতের মত কালো টাকা পাচার হয়ে যাচ্ছে।

ভারতের কালো টাকার একটি অংশ দেশের অভ্যন্তরে কালো টাকার সমান্তরাল অর্থনীতিকে পুষ্ট করে, আর বড় অংশটি বিদেশে পাচার হয়ে যায়। সুইজারল্যান্ড এবং অন্যান্য আয়করমুক্ত দেশে ব্যাঙ্কের গোপন অ্যাকাউন্টে সেগুলি জমা থাকে। বিদেশি ব্যাঙ্কে কালো টাকা রাখার জন্য সাধারণভাবে কোনও সুদ পাওয়া যায় না। পেলেও তার পরিমাণ খুবই কম। এমনকী কোথায় কোথাও ব্যাঙ্কে টাকা রাখার জন্য উল্টে চার্জ দিতে হয়। বিনিময়ে সেইসব দেশে ব্যাঙ্ক কালো টাকার গোপনীয়তা রক্ষার গ্যারান্টি দেয়।

কিন্তু কালো টাকা বা সাদা টাকা যাই হোক ব্যবহৃত না হলে, বা তার বিনিয়োগ না হলে সে টাকা মূল্যহীন। সুইস ব্যাঙ্ক বা অন্যত্র যেসব ভারতীয় কালো টাকা মজুত করেছে তাদের একটা বড় অংশ আয়কর কর্তৃপক্ষের চোখে ধুলো দিতে 'ট্রাস্ট' ব্যবস্থার আড়ালে নিজেদের লুকিয়ে ফেলে। এই ট্রাস্টগুলি স্বাধীনভাবে নিজেদের খুশিমতো চলতে পারে। কালো টাকার মালিকদের নিরাপদ আশ্রয় হিসাবে ব্যবহৃত হয় এই ট্রাস্ট। ট্রাস্টের অধীনে গঠন করা হয় একটি কোম্পানি। কোম্পানি মাঝে মাঝেই ডিভিডেন্ড ঘোষণা করে ট্রাস্টের হাতে মোটা অঙ্কের টাকা তুলে দেয়। ট্রাস্ট তখন সেই টাকা তার আসল মালিকদের হাতে তুলে দেয়। মজার ব্যাপার হল, বিদেশে গঠিত কোনও ট্রাস্টের বেনিফিসিয়ারি হিসাবে কোনও ভারতীয় যখন দেশে এসে টাকা পায় তখন তিনি যদি সে টাকার কর দেন তাহলে সরকার তাঁর আয় নিয়ে কোনও প্রশ্ন করবে না। এই কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য বহু ক্ষেত্রে মালিকরা সাময়িকভাবে অনাবাসী ভারতীয় হয়ে যান। এইভাবে ট্রাস্ট গঠন করে কালো টাকার একাংশ সাদা করে দেশে ফিরিয়ে আনার অবাধ সুযোগ তৈরি হয়েছিল ১৯৯৮ সালে। ঐ বছর ভারত সরকার উপহার কর তুলে দেয়। এর সদ্ব্যবহার করে ট্রাস্টের মাধ্যমে উপহার হিসাবে বিপুল টাকা দেশে ফিরিয়ে এনে কালো টাকা সাদা করে ফেলে অসাধু ব্যবসায়ীরা। কিন্তু পরবর্তীকালে কর আইন সংশোধন হলে এই ব্যবস্থা কিছুটা অকার্যকরী হয়ে যায়। বর্তমানে দুবাই হয়ে উঠেছে কালো টাকা সাদা করার স্বর্গরাজ্য।

সুইস ব্যাঙ্কে ভারতীয় আমানতকারীদের সম্পর্কে তথ্য বিনিময় সংক্রান্ত ভারত-সুইজারল্যান্ড চুক্তি স্বাক্ষর হয় ২০১০ সালের ৩০ আগস্ট। অন্যান্য আরও কিছু করমুক্ত দেশের সাথেও এই চুক্তি হয়। এর ফলে দুবাই, আবুধাবি এবং সংযুক্ত আরব আমির শাহীর ব্যাঙ্কে সুইস ব্যাঙ্কে রাখা কালো টাকা চলে আসে। দুবাই বর্তমান বিশ্বের উদীয়মান আর্থিক কেন্দ্র। এখানকার ব্যাঙ্কে টাকা আমানত হলে টাকার উৎস সম্পর্কে বেশি প্রশ্নের জবাব দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। দুবাইয়ে টাকা স্থানান্তরকরণের কাজটাও খুবই সহজ। একবার কালো টাকা দুবাইয়ে ঢুকে গেলে তা প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (এফ ডি আই) হিসাবে ভারতের বিভিন্ন প্রকল্পে বিনিয়োগ হতে আর কোনও বাধা থাকে না। আবার এভাবেও বিপদ পুরো না কাটলে দুবাই থেকে সিঙ্গাপুর হয়ে তা আনা হয়, এতে তার অতীত ইতিহাস নিয়ে কোনও প্রশ্নের জবাব কালো টাকার মালিককে দিতে হয় না। যদিও এক্ষেত্রে আয়ের উপর ১৭ শতাংশ হারে কর সিঙ্গাপুরে দিতে হয়। কিন্তু এভাবে এলে কালো টাকা সম্পূর্ণ সাদা হয়ে যায়। এছাড়া উদারনৈতিক সংস্কারের ফলে ভারতের শেয়ার বাজারে বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা একটি বিশেষ ব্যবস্থায় (পি এন বা পার্টিসিপেটরি নোট) লগ্নি করার সুযোগ পায়। এই পথে লগ্নীকৃত অর্থের উৎস গোপন থাকে। ফলে লক্ষ কোটি টাকা এভাবে শেয়ার বাজারে ঢুকছে, অর্থনীতিকে ফাঁপিয়ে তুলছে, ফাটকা খেলছে। আর সরকার অর্থনীতির সাফল্য বলে এই চাঙ্গা হওয়া শেয়ার বাজারকে দেখাচ্ছে, সন্দেহজনক এবং আপত্তিজনক লগ্নিকে স্বাগত জানাচ্ছে উদারনীতির নামে। এমনকী রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বারবার অর্থমন্ত্রককে পি এন নিষিদ্ধ করার কথা বললেও সরকার তা শোনেনি। ২০০৭ সালে পি এন পথে মাদক ব্যবসার অর্থ শেয়ার বাজারে ঢুকছে বলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক পর্যন্ত সরকারকে সতর্ক করেছিল। তৎকালীন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল বলেছিলেন, মুম্বাই এবং চেন্নাইতে শেয়ার মার্কেটে ভুয়ো নানা কোম্পানি আছে, তারা কারচুপি করছে এবং এইসব কোম্পানিগুলি নানা অসাধু কার্যকলাপের সাথে যুক্ত। সরকার এত গুরুত্বপূর্ণ একটি পর্যবেক্ষণকে কোনও গুরুত্ব দেয়নি। বরং উল্টে সরকারি নীতির ফলেই কালো টাকা তৈরি হচ্ছে, বিদেশে পাচার হচ্ছে এবং সাদা টাকা হিসাবে দেশে ফিরে এসে অর্থনীতিকে কব্জা করছে, নানা অসামাজিক কাজে লিপ্ত হচ্ছে, মুদ্রাস্ফীতি তৈরি করছে।

কালো টাকার পরিমাণ

কালো টাকা কত আছে তা জানা বাস্তবে সম্ভব নয়। তাও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশি-বিদেশি সংস্থা কালো টাকার পরিমাণ জানার চেষ্টা করছে। তবে সঠিকভাবে না জানা গেলেও এর পরিমাণ যে বিপুল তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। ১৯৫৫ সালে প্রখ্যাত ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক নিকোলাস কলডর দেখান যে, দেশের তৎকালীন জি ডি পি-র ৪-৫ শতাংশ অর্থাৎ ৬০০ কোটি টাকা হল কালো টাকা। ১৯৬৯ সালে বিচারপতি ওয়ানচু দেখান যে এর পরিমাণ ৭০০০ কোটি টাকা। গ্লোবাল ফিনান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটির (জি এফ আই) রিপোর্ট (২০১০) অনুযায়ী ভারতের মোট কালো টাকার পরিমাণ ৬৪ হাজার কোটি ডলার। এর মধ্যে ১৭,৮০০ কোটি ডলার (২৭.৮ শতাংশ) জমা রয়েছে দেশের অভ্যন্তরে। বাকি ৪৬,২০০ কোটি ডলার (৭২.২ শতাংশ) জমা হয়েছে বিদেশে। এই রিপোর্ট বলছে ১৯৪৮ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত ৬১ বছরে প্রায় ২২ লক্ষ কোটি টাকা দেশ থেকে গোপনে পাচার হয়েছে বিদেশে। দেখা গেছে যত টাকা বিদেশে পাচার হয়েছে তার অর্ধেকই ১৯৯১ সালে উদারনীতি চালু হওয়ার পর থেকে হয়েছে। আরও দেখা গেছে যে, ২০০৯ সালে বিশ্বের মোট কালো টাকার ৫৪.২ শতাংশ ভারতের। অর্থাৎ অর্ধেকেরও বেশি। বর্তমানে সুইস ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তাদের ব্যাঙ্কে ভারতীয় ব্যবসায়ী, রাজনীতিক, আমলা, শিল্পপতিদের ৭২ লক্ষ কোটি টাকার নিজস্ব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে। পৃথিবীর মধ্যে এই পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। ভারতের পর আছে রাশিয়া, তার ৪৭,০০০ কোটি ডলার জমা আছে। তারপর আছে গ্রেট ব্রিটেন, যার ৩৯,৮০০ কোটি ডলার জমা আছে। যা ভারতের থেকে অনেক কম।

মনে রাখতে হবে, উপরের হিসাবের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ কালো টাকা এদেশে আছে, যা একটা কালো অর্থনীতি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। হিসাব করে দেখা গেছে যে, বিদেশের ব্যাঙ্কে সঞ্চিত কালো টাকা উদ্ধার করে যদি দেশে আনা যায় তাহলে তার অর্ধেক দিয়ে ২৪ ঘন্টার মধ্যে দেশের সম্পূর্ণ বিদেশি ঋণ ২৩,০০০ কোটি ডলার মিটিয়ে ফেলা যাবে। তারপরও যা থাকবে তা বিদেশি ঋণের ১২ গুণ বাড়তি। ঐ টাকা বিনিয়োগ করলে তার সুদ ভারত সরকারের বার্ষিক বাজেটে বরাদ্দ অর্থের চেয়েও বেশি হবে। সরকারকে কর বসিয়ে আয়ও করতে হবে না। আর বাড়তি অর্থ দিয়ে কোটি কোটি গরিব মানুষের প্রত্যেককে ১০ লক্ষ টাকা করে দেওয়া যাবে। এর থেকে বোঝা যায় কত বিপুল পরিমাণ অর্থ কালো টাকা হিসাবে জমিয়ে রাখা আছে। যা দিয়ে প্রত্যেকের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্যের সমস্যাকে সহজেই মেটানো যায়।

অর্থনীতিতে কালো টাকার কুফল

কালো টাকার চলাচল বাস্তবে অর্থনীতিকে ধসিয়ে দেয়। আমরা জানি মুদ্রাস্ফীতির ফলে জিনিসপত্রের দাম হু হু করে বাড়তে থাকে। আসলে বাজারে টাকার জোগান যখন বেশি হয়ে যায় তখনই এই কাণ্ড ঘটে। মুদ্রাস্ফীতি রোখার জন্য সরকার যে সমস্ত পদক্ষেপ নেয় তা প্রায় অকার্যকরী হয়ে যায়, কারণ বাজারে সাদা টাকার পাশাপাশি বিশাল পরিমাণ কালো টাকার আমদানি হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বাজারে টাকার জোগান কমিয়ে একে শোধরানোর চেষ্টা করলেও বাস্তবে তা কার্যকরী হয় না। গোপনে থেকে কালো টাকা মুদ্রাস্ফীতির হার বহু গুণ বাড়িয়ে দেয়। কালো টাকা মজুতদারি, কালোবাজারিতে ব্যাপকভাবে মদত যোগায়, বেআইনি সব ধরনের কার্যকলাপের পিছনে আছে এই কালো টাকা। কালো টাকার লেনদেনের ফলে সমাজে মাদক ব্যবসা, বেআইনি অস্ত্র ব্যবসা, খুন, জখম, নারীপাচার, শিশুপাচার সহ নানা ধরনের অসামাজিক কাজ হু হু করে বাড়ছে। সরকার আর প্রশাসন পরিণত হচ্ছে ঠুঁটো জগন্নাথে। সাধারণ মানুষের জন্য সরকার বা প্রশাসন কোনও কাজ করে না। তারা কাজ করছে বিশাল কালো টাকার মালিকদের জন্য। ফলে বাস্তবে কালো টাকার অর্থনীতি দেশকে চালনা করছে।

পুঁজিবাদ কালো টাকার জন্ম দিচ্ছে, রক্ষাকর্তাও পুঁজিবাদ

দেশের শিল্পপতি-ব্যবসায়ীরাই যে কালো টাকার প্রধান কারবারী, একথা পরিষ্কার হয়ে যাওয়ায়, একদল যুক্তি করেন, করের হার খুব বেশি হওয়ার জন্যই কর ফাঁকি বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয়ত, শিল্প ব্যবসা নিয়ে নানা লাইসেন্স-পারমিটের ব্যবস্থা থাকায় ঘুষ দুর্নীতি ব্যাপক হয়। অথচ আর্থিক উদারনীতির পথ ধরে কোম্পানি কর সহ নানা প্রত্যক্ষ কর কমে গিয়েছে, লাইসেন্স-পারমিট ব্যবস্থা নিয়ে বিধিনিষেধ কার্যত নেই। তবুও দেখা যাচ্ছে ১৯৯১ সালে মুক্ত অর্থনীতি চালু হলে কালো টাকার পরিমাণ না কমে তা অনেক বেড়ে গেল। এতেই প্রমাণ হয়, কালো টাকা তৈরির পিছনে পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদদের যুক্তি নিতান্ত কুযুক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। লক্ষ কোটি টাকার মালিক শিল্পপতি, ব্যবসায়ীদের ব্যবসা করে মুনাফা করার অধিকার এদেশে আছে, এবং এইভাবে অর্জিত মুনাফা গোপনে পাচার করে দেওয়া বা বেনামে জমিয়ে রাখার অধিকারও আছে। দেখা যায় যে প্রায় প্রত্যেক বড় বড় ব্যবসায়ী মালিকের ভুয়ো হিসাবের জন্য একটা গোপন অ্যাকাউন্ট বই থাকে। এটা এখন নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে, মরণোন্মুখ পুঁজিবাদের এটাই বৈশিষ্ট্য। সম্প্রতি ইনফোসিসের

ছয়ের পাতায় দেখুন

খুচরো ব্যবসায় বিদেশি পুঁজি

একের পাতার পর

ইতিমধ্যে ভারতে পাইকারি ব্যবসায় ঢুকে পড়েছে ওয়ালমার্ট, মেট্রো, ক্যারফোর প্রভৃতি বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানিগুলি। এদের অনেকেই দেশীয় বৃহৎ পুঁজির মালিক কোনও না কোনও কোম্পানির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে এই ব্যবসায় নেমেছে। এখন খুচরো ব্যবসাতেও এই বিদেশি বহুজাতিকগুলির ঢোকার সুযোগ খুলে গেল।

ভারতবাসী এবং ভারতীয় অর্থনীতির উপর বিদেশি বিনিয়োগের ফলাফল কী হবে? ভারতবাসী বলতে যদি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষকে বুঝিয়ে থাকে তবে এই সিদ্ধান্তে তাদের কোন স্বার্থ রক্ষা হবে? দেশ জুড়ে উৎপাদন শিল্পে নতুন কর্মসংস্থান নেই বললেই চলে। কৃষিতেও শ্রমক্ষমতা উদ্বৃত্ত। ধনী-দরিদ্রে চূড়ান্ত বৈষম্যের কারণে দেশের ৭৭ শতাংশ মানুষের দৈনিক আয় ২০ টাকার কম। এই পরিস্থিতিতে এই খুচরো ব্যবসার মাধ্যমেই আজও বিপুল সংখ্যক মানুষ কিছুটা রোজগার করে সংসার চালানোর চেষ্টা করে। কাজের সুযোগ না পেয়ে বা কাজ হারিয়ে অতি স্বল্প পুঁজি নিয়ে পাড়ার গলির মুখে হোক, শহরের ফুটপাথে হোক, যা হোক একটা কিছু বিক্রি করে অন্ন সংস্থানের চেষ্টা করে। খুচরো ব্যবসায় দেশি-বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের বিভিন্ন দিক বিচারের জন্য গঠিত পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটি ২০০৯ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে সমীক্ষা রিপোর্ট পেশ করেছে তাতে বলা হয়েছে, প্রায় ২০ কোটি মানুষ অসংগঠিত খুচরো ব্যবসার উপর নির্ভরশীল। ৪ কোটি মানুষের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করেছে এই ক্ষেত্রটি। ঐ কমিটি খাদ্য, মুদিখানা দ্রব্য এবং ভোগ্যপণ্যে দেশি-বিদেশি বৃহৎ পুঁজির অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ করার সুপারিশ করেছে। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার কোনও বাছবিচার না করেই এই অনুমোদন দিতে চলেছে।

বিদেশি বৃহৎ পুঁজির দাপটে দেশীয় খুচরো ব্যবসায়ীরা যে উৎখাত হয়ে যাবে এটা কোনও কষ্ট-কল্পনা নয়। পুঁজির নিয়মই হল, বৃহৎ পুঁজি ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র পুঁজিকে গ্রাস করে। আগে বড় বড় শহরগুলিতে অসংখ্য ছোট ছোট সাবানের কারখানা, তেলের কল, চানাচুর, পাঁউরুটির কারখানা, ছোট ছোট প্রেস ছিল। দেশীয় বৃহৎ পুঁজির দাপটে সেগুলি আজ আর প্রায় দেখা যায় না। যে সমস্ত শহরে ইতিমধ্যেই মেট্রো প্রভৃতি বিদেশি কোম্পানিগুলি পাইকারি ব্যবসা শুরু করেছে, সেখানেই স্থানীয় পাইকারি ব্যবসা দারুণ রকম মার খাচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ বিশ্বের যেখানেই বৃহৎ পুঁজি খুচরো বাজারে ঢুকেছে, সেখানেই সে তার একাধিপত্য বিস্তার করেছে। বাজার থেকে মুছে গিয়েছে ছোট পুঁজির মালিক খুচরো ব্যবসায়ীরা। এ দেশেও মুদি, স্টেশনারি, ছোট দোকান, সবজি বিক্রেতা, হকার প্রভৃতি পেশার সাথে যুক্ত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা এই প্রতিযোগিতায় ওয়ালমার্ট, মেট্রোর সঙ্গে পেরে উঠবে না, উৎখাত হয়ে যাবে। কিন্তু কাজ হারিয়ে তারা যাবে কোথায়? চূড়ান্ত সংকটে জর্জরিত পুঁজিবাদী এই ব্যবস্থায় কোথাও কি বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে? খুচরো ব্যবসার সাথে যুক্ত এই মানুষগুলির বেশিরভাগই অল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত এবং প্রায় নিঃসম্বল বললেই হয়। আবার অনেকে আছেন, যথেষ্ট শিক্ষাদীক্ষা থাকা সত্ত্বেও যারা কোনও চাকরি জোটাতে না পেরে কঠোর পরিশ্রমসাধ্য এই কাজে আসতে বাধ্য হয়েছে। ভয়াবহ বেকারত্বের বর্তমান পরিস্থিতিতে আর একটা কাজ জুটিয়ে নেওয়াও তাদের পক্ষে অসম্ভব বললেই চলে। ফলে বেকার হয়ে পথে পথে ঘোরা ছাড়া তাদের সামনে আর কোনও বিকল্প থাকবে না। এরপরেও কি বলা যাবে ভারতীয় অর্থনীতির স্বার্থ মানে ভারতের আপামর জনসাধারণের স্বার্থ? যে সরকার কোটি কোটি বেকারের কাজের ব্যবস্থা করতে পারে না, উপরন্তু কাজে যুক্ত কয়েক কোটি মানুষের কাজ কেড়ে নিতে চায়, সেই সরকারকে কি জনগণের সরকার বলা চলে? অথচ এই সরকারই যে কোনও নীতিগত পদক্ষেপ নেওয়ার সময় সর্বদাই জনগণের স্বার্থের দোহাই দেয়। ভারতবাসী বলতে সরকার বাস্তবে এই মানুষগুলিকে বোঝে না, বোঝে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের, যারা এই বিদেশি বহুজাতিকগুলির সাথে গাঁটছড়া বেঁধে মুনাফার বখরা পাবে, আর তার বলি হবে এই মানুষগুলি।

শিল্পমহল, অর্থনীতিবিদদের একাংশ এবং বৃহৎ পুঁজি পরিচালিত সংবাদমাধ্যমগুলি রব তোলার চেষ্টা করছে, এই লগ্নির পথ খুলে গেলে নাকি কম দামে বিভিন্ন পণ্য কেনার সুযোগ পাবেন মধ্যবিত্তরা। কমবে মূল্যবৃদ্ধি। তৈরি হবে কাজের সুযোগ। অবশ্য এমন কথা এই প্রথম নয়। নয়ের দশকের গোড়ায় যখন উদার আর্থিক নীতি চালু হয়, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তখন অর্থমন্ত্রী ছিলেন। তিনি দেশের সাধারণ মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, দশটা বছর ধৈর্য ধরুন, তারপরই এর সুফল পাবেন। এমনকী ভবিষ্যৎ সুফলের আশায় ত্যাগ স্বীকারেরও আহ্বান জানিয়েছিলেন তিনি। সাধারণ মানুষ আজও ত্যাগ স্বীকার করে চলেছে, আর তাদেরই চোখের সামনে তাদেরই পরিশ্রমের ফসল মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি দু'হাতে লুঠ করে চলেছে।

যে মধ্যবিত্ত অংশের মানুষ কম দামে বিভিন্ন পণ্য কেনার সুযোগ পাবে বলে পুঁজিপতি এবং তাদের তল্পিবাহকরা বলছে, তারা সমাজের কতটুকু? তাদের সুখভোগের ব্যবস্থার জন্য কি বাকি ৯০ ভাগ মানুষকে মূল্য দিতে হবে? রিটেল বহুজাতিকগুলি প্রথমে বাজার ধরার জন্য হয়ত কিছুটা কম দামে পণ্য বিক্রি করবে। শিল্পপণ্যই হোক, আর কৃষিপণ্যই হোক, সরাসরি উৎপাদকদের কাছ থেকে বা কৃষকদের থেকে বিপুল পরিমাণ পণ্য সরাসরি সংগ্রহের কারণে যথেষ্ট লাভ রেখেও কম দামে বিক্রি তাদের পক্ষে সম্ভব হবে। একবার বাজারে নিজেদের আধিপত্য কায়েম করার পর, অর্থাৎ প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে খুচরো ছোট দোকানদাররা বাজার থেকে হঠে গেলে এই দাম তারা তাদের ইচ্ছেমতো ঠিক করবে। সাধারণ মানুষও বাধ্য হবে এদের কাছে যেতে এবং বেশি দাম দিয়ে জিনিস কিনতে। ফলে খুচরো ব্যবসায় বিদেশি বৃহৎ পুঁজির অনুপ্রবেশে দাম কমবে, এ আষাঢ়ে গল্প ছাড়া আর কিছু নয়।

সরকারি সিদ্ধান্তের উমেদাররা বলছেন, দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের পরিচালিত এই বৃহৎ শপিং মলগুলিতে নাকি কর্মসংস্থান হবে। এ গল্পও ডাহা মিথ্যা। উচ্চ প্রযুক্তি ব্যবহারের কারণে বিদেশি পুঁজি পরিচালিত শপিং মল বা বাজারগুলিতে কর্মসংস্থান যা হবে তা নামমাত্র। কিন্তু বৃহৎ পুঁজির দাপটে ছোট ও মাঝারি দোকানগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে যে বিপুল সংখ্যক মানুষ বেকার হয়ে পড়বে, তার তুলনায় কর্মসংস্থান হবে কতটুকু? বৃহৎ পুঁজির প্রবেশে এই ক্ষেত্রে ২০ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থানের যে কথা প্রচার করা হয়েছে, পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটি তাতে ঘোরতর সন্দেহ প্রকাশ করেছে। দেখা যাচ্ছে, শপিং মলে যদি এক জন কাজ পায় তবে এই দোকানগুলিতে কাজ হারাবে কমপক্ষে ৪০ জন। একে কি কর্মসংস্থান বলে? স্ট্যান্ডিং কমিটি বলছে, এই কর্পোরেট সংস্থাগুলি চাষিদের প্রথমে 'ভালো' দাম দিলেও ধীরে ধীরে প্রচলিত ও নিয়ন্ত্রিত বাজারগুলি উঠে গেলে চাষিরাও পুরোপুরি এদের মুঠোর মধ্যে এসে পড়বে। তখন তাদের নির্ধারিত জলের দামেই ফসল বিক্রি করতে বাধ্য হবে চাষিরা।

এমনকী এই সমস্ত কোম্পানিগুলি কোনও শ্রমআইন মানে না। কর্মচারীদের অতিরিক্ত সময় খাটিয়ে নেয়, অথচ সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম বেতনও দেয় না। কোথাও কোথাও এমনকী কর্মচারীদের সাপ্তাহিক ছুটি পর্যন্ত নেই। যে কোনও এই ধরনের সংগঠিত বাজারে গিয়ে যে কেউ এ ঘটনা জানতে পারবেন।

এমন ভয়ঙ্কর পরিণতির নিশ্চিত সম্ভাবনা সত্ত্বেও সরকার এই অনুমোদন দিচ্ছে কেন? এর পিছনে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন ও অন্যান্য বিদেশি পুঁজির সাথে ভারতীয় পুঁজির বোঝাপড়া। অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জীর সাম্প্রতিক মার্কিন সফর, তারপরই মার্কিন বিদেশ সচিব হিলারি ক্লিন্টনের ভারত সফর এবং সর্বশেষ ২২ জুলাই কেন্দ্রীয় সচিবদের এক কমিটি খুচরো ব্যবসায় ৫১ শতাংশ পর্যন্ত বিদেশি লগ্নি অনুমোদন করার বিষয়ে সুপারিশের মধ্যে যে একটা যোগসূত্র রয়েছে তা বলাই বাহুল্য। গোটা আমেরিকা-ইউরোপের অর্থনীতি মন্দার ধাক্কায় ধুঁকছে। উৎপাদন শিল্প মার খাচ্ছে, বেকার বাড়ছে হু হু করে, বাড়ছে গণঅসন্তোষ। বিপুল পরিমাণ উদ্বৃত্ত পুঁজি বিনিয়োগের অভাবে অলস হয়ে রয়েছে। ফলে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি চাপ দিচ্ছে ভারতীয় খুচরো বাজার দ্রুত তাদের জন্য খুলে দিতে। বিপরীতে ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজিও আজ বিপুল শক্তির অধিকারী, যা সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি হিসাবে দেশের গণ্ডির বাইরে বিদেশে বাজার খুঁজে বেড়াচ্ছে। পরস্পরের এই প্রয়োজন থেকেই যে বোঝাপড়া তারই পরিণতি সরকারের এই সিদ্ধান্ত। সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির শিরোমণি মার্কিন শিল্পমহলকে সন্তুষ্ট করা ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজির প্রয়োজন দু'টি কারণে। এক, বিশ্বের দেশে দেশে পুঁজি বিনিয়োগের জন্য মার্কিন 'অনুমোদন' না হলেও অন্ততপক্ষে বন্ধুত্বপূর্ণ 'সহযোগিতা' প্রয়োজন। দুই, বনেদি পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সাথে কুলীন হিসাবে একাসনে বসার যোগ্যতার জন্য যা প্রয়োজন, যেমন পরমাণু শক্তিধর হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়া, নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী কমিটির সদস্য হওয়া প্রভৃতি সবই মার্কিন অনুমোদন ছাড়া সম্ভব নয়। তাই ভারতের লোভনীয় খুচরো ব্যবসার বাজার বিদেশি পুঁজির জন্য খুলে দেওয়ার প্রস্তাব ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণী এবং তার রাজনৈতিক ম্যানেজার হিসাবে কংগ্রেস জোট সরকার মেনে নিয়েছে। ফলে এ কথা স্পষ্ট যে ভারত সরকারের এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে দুই দেশের পুঁজিপতি শ্রেণীর ব্যবসায়িক লেনদেনের বিষয়ে বোঝাপড়ার ফল, এর সাথে দেশের ১২০ কোটি সাধারণ মানুষের স্বার্থের কোনও সম্পর্ক নেই। বরং এই পুঁজিপতিদের মুনাফার স্বার্থ পূরণের জন্য সাধারণ মানুষের স্বার্থ বলি দিচ্ছে তারা।

স্বাভাবিকভাবেই দেশের কোটি কোটি মানুষ, যাদের জীবন বিপন্ন হতে চলেছে, সেই খুচরো ব্যবসায়ীরা, অপরদিকে সচেতন সাধারণ মানুষ সরকারের এই সর্বনাশা সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। মানুষের এই প্রবল ক্ষোভ দেখে তাকে ভোটের রাজনীতির কাজে লাগাতে মাঠে নেমে পড়েছে একদিকে পুঁজিপতি শ্রেণীর বিশ্বস্ত দল বিজেপি, অপরদিকে শ্রম ও পুঁজির মধ্যে আপসকামী শক্তি এবং শেষ পর্যন্ত পুঁজিপতি শ্রেণীরই স্বার্থরক্ষাকারী সিপিএম।

পুঁজিবাদ আজ চূড়ান্ত সংকটে জর্জরিত। সেই সংকট থেকে রেহাই পেতে পুঁজিপতি শ্রেণী তথা তাদের স্বার্থ রক্ষাকারী সরকার এই সংকটের বোঝা দেশের সাধারণ মানুষের উপর চাপিয়ে চলবে। তাই সাধারণ মানুষের উপর আক্রমণের এই শেষ নয়। যত দিন যাবে ততই তা বাড়তে থাকবে— যতদিন না শোষণমূলক, মুষ্টিমেয় মানুষের স্বার্থরক্ষাকারী এই পুঁজিবাদী সমাজকে উৎখাত করা যাচ্ছে। এই আক্রমণকে কিছুটা হলেও প্রতিরোধ করতে প্রয়োজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, হকার থেকে শুরু করে সর্বস্তরের মেহনতি মানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের। প্রতিটি শহরে, বাজারে, ফুটপাথে এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) ভারত সরকারের এই চরম জনস্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা করে একে প্রতিহত করতে সর্বস্তরের মানুষকে আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

মায়াহাউড়ীতে মহিলা সম্মেলন

নারী নির্যাতন ও নারী পাচারের প্রতিবাদে ১০ জুলাই প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে দঃ ২৪ পরগণার জেলার জয়নগর থানার মায়াহাউড়ী অঞ্চলের মহিলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল গোপাল জুনিয়র হাই স্কুলে। সম্মেলনের প্রস্তুতি পর্বে মা-বোনেদের নিয়ে ৮-১০টি জায়গায় ঘরোয়া আলোচনা হয়; পাড়া কমিটিও তৈরি হয়। তাঁরাই দায়িত্ব নিয়ে প্রায় দুই শতাধিক সদস্য সংগ্রহ করেন। সভাপতিত্ব করেন আমিনা নাইয়া। প্রধান অতিথি ছিলেন অঞ্চলের বিশিষ্ট জননেতা এস ইউ সি আই (সি) দলের অঞ্চল সম্পাদক কমরেড খালেক মোল্লা, বক্তব্য রাখেন সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সুজাতা ব্যানার্জী। নারী নির্যাতন, নারীপাচার, নারীদেহের ব্যবসা, মদ, জুয়া, সাট্টা, ব্লু-ফিল্ম প্রভৃতি সমস্যা তুলে ধরে এবং তার প্রতিকারের পথ নির্দেশ করে মূল প্রস্তাব পাঠ করেন কমরেড রেখা দাস। সম্মেলনে কমরেড আমিনা নাইয়াকে সভানেত্রী এবং কমরেড তনুশ্রী হালদারকে সম্পাদিকা করে ২৩ জনের কমিটি তৈরি হয়।

মোটরভ্যান চালকদের দার্জিলিং জেলা সম্মেলন

সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের দার্জিলিং জেলা ৪র্থ বার্ষিক সম্মেলন ১৯ জুলাই শিলিগুড়ি মহকুমার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের অন্তর্গত ঘোষ পুকুর কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হয়। ২০০ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ইউনিয়নের জেলা সভাপতি কমরেড গণেশ রায়। প্রতিবেদন পাঠ করেন জেলা সম্পাদক কমরেড জয় লোধ। প্রধান বক্তা ছিলেন সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের রাজ্য সভাপতি কমরেড সুজিত ভট্টশালী এবং রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন এ আই ইউ টি ইউ সি দার্জিলিং জেলা সভাপতি কমরেড গৌতম ভট্টাচার্য। সম্মেলন থেকে ৩৯ জনের শক্তিশালী জেলা কমিটি গঠন করা হয়। সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন যথাক্রমে কমরেডস জয় লোধ, পরিতোষ রায় ও গোবিন্দ রায়।

প্রকাশিত হল

কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় উন্নত কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জনের সংগ্রামে সামিল হোন

প্রভাস ঘোষ

মহান ২৪শে এপ্রিলের আহ্বান

মানিক মুখার্জী, কৃষ্ণ চক্রবর্তী, রণজিৎ ধর, অসিত ভট্টাচার্য

৫ আগস্টের ব্যাঙ্ক ধর্মঘট ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

ব্যাঙ্ক কর্মচারী এবং অফিসারদের ৯টি সংগঠনের যুক্ত মোর্চা ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাঙ্ক ইউনিয়নস (ইউ এফ বি ইউ) গত ৭ জুলাই দেশ জুড়ে ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল। তা কোনও এক বিশেষ কারণে পিছিয়ে ৫ আগস্ট করা হয়েছে। আউটসোর্সিং, সরকারি নিয়ন্ত্রণ ধীরে ধীরে কমিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিকে বেসরকারিকরণের দিকে ঠেলে দেওয়া, শিল্প মালিকদের নতুন ব্যাঙ্ক খুলতে অনুমোদন দেওয়া, প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগকে নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করা, খাণ্ডেলওয়াল কমিটির সুপারিশ প্রভৃতির বিরুদ্ধে এই ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। যে ক্ষেত্রে বিরোধিতা করা হয়েছে বা যে দাবিগুলি উত্থাপিত হয়েছে তার বেশির ভাগই যুক্তিযুক্ত এ নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এর বাইরেও বহু দাবি রয়েছে, যেমন কর্মচারী নিয়োগ, চুক্তির ভিত্তিতে কর্মচারী নিয়োগের অবসান এবং যারা চুক্তির ভিত্তিতে আছে তাদের স্থায়ী করা, পার্ট টাইম কর্মচারীদের ফুল টাইম কর্মচারীতে পরিণত করা, সেভিংস ব্যাঙ্কের সুদ বৃদ্ধি করা প্রভৃতি যা ব্যাঙ্ক কর্মচারী এবং গ্রাহক স্বার্থের পরিপূরক — তাও ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের দাবির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার ছিল। এই দাবিগুলি নিয়ে দেশব্যাপী গ্রাহকদের যুক্ত করে ব্যাঙ্ককর্মচারী আন্দোলন গড়ে তোলা খুবই জরুরি। কেবল এক দিনের একটা ধর্মঘট নয়, সমস্ত কর্মচারীদের যুক্ত করে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনই এই সমস্যা সমাধানের প্রকৃত রাস্তা হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু তেমন কোনও উদ্যোগ এ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে না, বরং ইউ এফ বি ইউ নেতৃত্ব যেখানে তথাকথিত বামপন্থীদের প্রভাব বেশি এবং সেই বামপন্থীরা যেহেতু গত কয়েকটি নির্বাচনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যথেষ্ট পিছিয়ে পড়েছে, তাই তাদের হৃত ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা হিসাবে তারা এই ধর্মঘটকে দেখছে। ব্যাঙ্ককর্মচারীদের ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার এই প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রসূত।

এ ক্ষেত্রে যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা হল, গত নবম দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে ইউ এফ বি ইউ নেতৃত্ব যেভাবে বেতন এবং পেনশনের ক্ষেত্রে কর্মচারীদের সঙ্গে প্রতারণা করে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশ্য হাসিল করতে সাহায্য করেছে, তার ফলে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের বেতনের চেয়েও ব্যাঙ্ককর্মচারীদের বেতন কমে গেছে। এতে পেনশন খরচ বহন করতে হবে কর্মচারীদের, যা ব্যাঙ্ক পেনশন রেগুলেশন অ্যাক্ট ১৯৯৫-এর বিরোধী। ১ এপ্রিল ২০১০ বা তারপর যাঁরা ব্যাঙ্কের চাকরিতে ঢুকেছেন তাঁদের ক্ষেত্রে প্রচলিত পেনশনের পরিবর্তে ক্ষতিকারক নতুন পেনশন নীতি নেওয়া হচ্ছে — সে ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ নীরব।

তাছাড়া আরও একটি প্রশ্ন গভীরে ভাবতে হবে যে, এই নেতৃত্বের কি কোনও নৈতিক অধিকার আছে এই দাবিগুলিকে সামনে রেখে ধর্মঘট ডাকার? কেন না বহু ক্ষেত্রেই তারা ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে চুক্তি করে জনস্বার্থবিরোধী কিছু কার্যক্রমকে ব্যাঙ্কের মধ্যে ঢুকিয়েছেন। গত অষ্টম এবং নবম দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে আউটসোর্সিং নিয়ে যে কথা বলা হয়েছে, তাতে আউটসোর্সিং-এর বিরোধিতা করার কোনও নৈতিক অধিকার তাদের থাকে না। চুক্তির ভাষায় — "...হোয়াইল ইট শ্যাল বি দি ব্যাঙ্কস এন্ডেভার টু রিট্রেঞ্চ/ রি-স্কিল স্টাফ অ্যান্ড টু ডেভেলপ ইন-হাউস কমপিটেন্স, দে মে আউটসোর্স আই টি অ্যান্ড ইটস রিলেটিভ অ্যাক্টিভিটিস ইন রেসপেক্ট অফ স্পেশালাইজড এরিয়াস হোয়্যার ইন-হাউস ক্যাপাবেলিটি ইজ নট অ্যাভেলেবেল...।" আধুনিক ব্যাঙ্ক পরিষেবার প্রায় সবটাই তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর। সেক্ষেত্রে আউটসোর্সিং-এর পূর্ণ অধিকার কি এই চুক্তির মাধ্যমে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হয়নি? এর পরেও কি আউটসোর্সিং-এর বিরুদ্ধে আন্দোলন তো দূরের কথা — কোনও কথা বলা এই নেতৃত্বের শোভা পায়? বিভিন্ন ব্যাঙ্কের শেয়ার ইস্যুর ক্ষেত্রেও এই নেতৃত্বের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সহায়তা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। শেয়ার ইস্যুর সময় বস্তুত কোনও জোরদার আন্দোলন না করা নেতাদের পক্ষ থেকে নামে-বেনামে শেয়ার কেনাতে ঝাঁপিয়ে পড়ার মধ্য দিয়ে অন্যদেরও উৎসাহিত করার পর শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে ব্যাঙ্কগুলিকে বেসরকারিকরণ করার চেষ্টা চলছে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করার কোনও মানে হয় না। কন্ট্র্যাক্ট কর্মীদের নিয়ে বিভিন্ন ব্যাঙ্কে তাঁরা ইউনিয়ন করছেন কিন্তু তাঁদের ব্যাঙ্কের স্থায়ী কমিটিতে পরিণত করার দাবি এখানে উত্থাপিত হয়নি। এমন বহু ক্ষেত্রেই তাঁদের দ্বিচারিতা স্পষ্ট।

ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে এই সমস্ত পরিবর্তন আসছে গ্লোবালাইজেশন বা ভুবনীকরণের পথ বেয়ে। নরসিংহম কমিটির সুপারিশ যা এখন বাস্তবায়িত হচ্ছে তাও ভুবনীকরণের পথ বেয়ে গড়ে উঠেছিল। বলা বাহুল্য, এই নরসিংহম কমিটিকে দ্বিতীয় বারের জন্য নিয়ে এসেছিল তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সরকার — যার শরিক ছিল তথাকথিত বামপন্থীদের কেউ কেউ। কেউ কেউ বাইরে থেকে সমর্থন জুগিয়েছিল। সি পি আই-এর ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত ছিলেন ঐ সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। খাণ্ডেলওয়াল কমিটির রিপোর্টেও এই সুর প্রতিধ্বনিত হয়েছে। সুপারিশে বলা হয়েছে, ব্যাঙ্কের সাধারণ কাজ (নন-কোর জবস) বাইরের ব্যক্তি বা প্রতিনিধিকে দিয়ে করানো অর্থাৎ আউটসোর্স করা, প্রত্যেক ব্যাঙ্কের লাভ, আর্থিক সঙ্গতি ও উৎপাদনশীলতা বিবেচনা করে ব্যাঙ্কভিত্তিক বেতন চুক্তি, স্থায়ী অঙ্কের পরিবর্তে পরিবর্তনশীল মজুরি ইত্যাদি। মুখে এই গ্লোবালাইজেশনের বিরোধিতা করতে করতেই এই ইউনিয়নগুলির একটা বড় অংশের পরামর্শদাতা বা সঞ্চালক রাজনৈতিক দলগুলি তাদের যোগ্যতা এবং দক্ষতা অনুযায়ী গ্লোবালাইজেশনের নীতিগুলিকে কার্যকর করছে। এ রাজ্যের ক্ষমতায় থেকে এস ই জেড-এর পক্ষে মুখখোলা থেকে শুরু করে নানা কার্যক্রম নিয়েছিল সি পি এম নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকার। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের রক্তাক্ত ইতিহাস সে কথাই বলছে। তাই এদের পক্ষে এই লড়াইকে বেশি দূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরাম তার জন্মলগ্ন থেকেই এই বিষয়গুলি ব্যাঙ্ককর্মচারীদের সামনে নিয়ে যাচ্ছে এবং ন্যায়সঙ্গত দাবি নিয়ে ক্ষমতা অনুযায়ী আন্দোলন গড়ে তুলছে। গত ৫ জুলাই এই দাবিগুলি নিয়ে কলকাতার বিবাদি বাগে সারাদিনব্যাপী অবস্থান-বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয় সংগঠনের রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে।

একদিনের একটা ধর্মঘট এই সমস্যা সমাধানের পথ নয়। ৫ আগস্টের ধর্মঘটকে সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে। ইউ এফ বি ইউ-এর মতো আপসকামী নেতৃত্ব একদিনের একটা ধর্মঘট করে তাদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেতে পারে, কিন্তু সমস্যা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে যাচ্ছে। লক্ষ্য পূরণ করতে হলে চাই আপসহীন লাগাতার শক্তিশালী আন্দোলন।

কমরেড কালিকা মুখার্জীর জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড কালিকা মুখার্জী দীর্ঘদিন হৃদরোগের অসুস্থতায় শয্যাশায়ী থাকার পর ২৫ জুলাই কসবায় নিজ বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যু সংবাদ পেয়েই রাজ্য কমিটির সদস্য, কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড চিররঞ্জন চক্রবর্তী তাঁর বাসভবনে যান ও মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

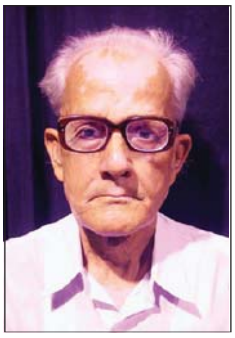

কসবা সাধারণ পাঠাগার ও 'আলোর পরশ' স্কুলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন তিনি। প্রথমে তাঁর মরদেহ ঐ দুটি প্রতিষ্ঠানে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর নিয়ে আসা হয় লেনিন সরণীতে দলের রাজ্য দপ্তরে। ইতিমধ্যে রাজ্য দপ্তরে রক্তপতাকা অর্ধনমিত করা হয়। তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে কলকাতার বিভিন্ন এলাকা থেকে দলের নেতা-কর্মী-সমর্থকরা রাজ্য দপ্তরের সামনে সমবেত হন। রাত্রি ৮টায় তাঁর মরদেহ পৌঁছালে 'কমরেড কালিকা মুখার্জী লাল সেলাম' ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে এলাকা। এখানে প্রয়াত কমরেডের মরদেহে মাল্যদান করে বৈপ্লবিক শ্রদ্ধা জানান দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ, পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড রণজিৎ ধর ও কমরেড অসিত ভট্টাচার্য, পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড মানিক মুখার্জীর পক্ষে কমরেড শঙ্কর সাহা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসুর পক্ষে কমরেড তপন রায়চৌধুরী সহ উপস্থিত রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর ও রাজ্য কমিটির সদস্যবৃন্দ। দল ও গণসংগঠনগুলির বিভিন্ন আঞ্চলিক কমিটি ও ইউনিটগুলির পক্ষ থেকেও মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। এরপর প্রয়াত নেতার মরদেহ রাসবিহারি অ্যাভিনিউ মোড় থেকে কর্মীরা মিছিল সহযোগে কেওড়াতলা শ্মশানে নিয়ে যান। আন্তর্জাতিক সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে কমরেড কালিকা মুখার্জীকে শেষ বিদায় জানানো হয়।

১২ আগস্ট কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্সস্টিটিউট হলে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হবে, বক্তব্য রাখবেন কমরেড মানিক মুখার্জী। কমরেড কালিকা মুখার্জী স্মরণে দলের শ্রদ্ধার্ঘ স্মরণসভায় রাখা হবে এবং পরে গণদাবী'তে প্রকাশিত হবে।

কমরেড কালিকা মুখার্জী লাল সেলাম

ঋণসংকটে জেরবার মার্কিন অর্থনীতি

একের পাতার পর

ফলে ও নতুন নিয়োগ না ঘটায় বেকারির হার ৯.২ শতাংশ হয়ে গেছে, যা ১৯৩০ সালের মহামন্দার সময়ের সমান। এই বেকারি আটকাবার কোনও উপায় মার্কিন সরকার দেখাতে পারছেনা, কারণ কলকারখানা খুলছে না, উৎপাদন বাড়ছে না, বার্ষিক জিডিপি বৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে মাত্র ১.৩ শতাংশ।

এই পটভূমিতেই মার্কিন সরকারের ঋণ সংকটকে দেখতে হবে। সমস্যাটা সৃষ্টি হয়েছে মার্কিন সরকারের ঋণের অঙ্কের সীমা নিয়ে। আমেরিকার পার্লামেন্ট বা 'কংগ্রেস' এর বিধান অনুযায়ী সরকারি ঋণের সীমাটা সংশোধিত করে বাড়ানো হয়েছে। বর্তমান সরকারের ঋণ সীমা হচ্ছে ১৪.৩ লক্ষ কোটি ডলার যা আমেরিকার মোট জিডিপি র ৯৫ শতাংশ। অর্থাৎ আমেরিকার মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ডলার মূল্য যা, তার ৯৫ শতাংশ পর্যন্ত অর্থ মার্কিন সরকার ঋণ করতে পারে। এখন অবস্থা এমন জায়গায় পৌঁছেছে,অর্থাৎ আমেরিকার সরকারি কোষাগারের অবস্থা এতই সঙ্গীন যে, এই বিপুল পরিমাণ ঋণ দিয়েও চলছে না, আরও বেশী ঋণ চাই। এজন্য মার্কিন কংগ্রেসের অনুমোদন নিয়েই সমস্যা দেখা দিয়েছে। ওদেশের দ্বিদলীয় সংসদীয় ব্যবস্থার এক শরিক ডেমোক্রেটরা এখন সরকারে, বারাক ওবামা এই দলেরই লোক। বিরোধী পক্ষে আছে রিপাবলিকান পার্টি। তারা আপত্তি তুলেছে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি নিয়ে নয়, কোষাগারের সংকট সমাধানের উপায় নিয়ে — সরকারি আয় বা রাজস্ব বাড়ানো বা উল্টোভাবে সরকারি ব্যয় কমানোর জন্য কী পথ নেওয়া হবে। ডেমোক্রেট নেতা ওবামার প্রস্তাব করের পরিমাণ ও পরিধি বাড়ানো হোক। রিপাবলিকানদের পাল্টা যুক্তি ধনীদের উপর আর কর বসানো চলবে না, তার পরিবর্তে জনসাধারণের জন্য সরকার যে সব ভাতা ও ভর্তুকি দেয়, বিশেষত মেডিকেল সাহায্য, সেসব ছাঁটাই করা হোক। তবে কী বারাক ওবামা জনস্বার্থের সেবক. আর রিপাবলিকানরা ধনীদের? আদপেই তা সত্য নয়। দুটো দলই মার্কিন পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের একনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত সেবাদাস। কালো চামড়ার ওবামাকে সামনে রেখে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ 'গণতন্ত্র' 'সমানাধিকার','জনদরদী শাসক' ইত্যাদি যে সব বুলি প্রচার করেছিল, তার অন্তসারশূন্যতা ধরা পড়ে গেছে ইতিমধ্যেই। আসলে দুপক্ষ দুটি পুঁজিবাদী ফর্মুলা নিয়ে চলছে বললে হয়তো ভাল হত, কিন্তু তার চেয়ে বড় সত্য হল ওবামার সামনে রয়েছে ২০১২ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন, যেখানে দ্বিতীয়বার জিততে হলে তার জনদরদী মুখোশ চাই, যেটার সুযোগ দিতে রিপাবলিকানরা নারাজ। যাই হোক, দুই দলের প্রস্তাব থেকে কিছু যোগ বিয়োগ করে ঋণ সীমার সংকট উতরে যাবে আমেরিকা। এটা না হলে কী হতে পারত, সেই আলোচনা অবান্তর। বস্তুত, আমেরিকার ঋণসংকট ও তা থেকে পরিমাণ নিয়ে আমেরিকার সংবাদ মাধ্যমে হৈ চৈ তোলাই হল সংকটের মূল কারণকে জনচক্ষে আড়াল করার জন্য। দ্বিতীয়ত, এই ভান করার জন্য যে, সরকারের ঋণ সীমা বাড়ালে দেশের জনগণের দুর্দশা ঘুচবে, যা মিথ্যা ছাড়া কিছু নয়।

আমেরিকার মতো এত বিশাল ও শক্তিশালী অর্থনীতিকে এ ভাবে ঋণভারে জর্জরিত হতে হল কেন? বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যমই বলে দিচ্ছে, যুদ্ধ ও অস্ত্রসজ্জায় লাগাতার ও ক্রমবর্ধমান ব্যয়, ব্যাঙ্কসংকটের পর ব্যাঙ্কগুলির 'উদ্ধার তহবিলে' ব্যয়, আর মন্দার থেকে আর্থিক পরিস্থিতিকে টেনে তোলার জন্য স্টিমুলাস প্যাকেজ মালিকদের দিতে ব্যয় — সব মিলিয়ে সরকারি ব্যয় তার আয়কে ব্যাপকভাবে ছাপিয়ে গিয়েছে। তবে বিষয়টা এমন নয় যে, মার্কিন সরকার এ সব ব্যয় চাইলেই এড়াতে পারত। সামরিক উৎপাদন ছাড়া মার্কিন অর্থনীতির চাকা ঘুরবেই না, ব্যাঙ্কগুলোকে টাকা দিয়ে উদ্ধার না করলে মালিকী ব্যবস্থা টলে যাবে, আর মন্দায় জর্জরিত অর্থনীতিকে বাঁচাতে স্টিমুলাস প্যাকেজ ওবামা থেকে মনমোহন সিং সবারই একমাত্র হাতিয়ার।

আর্থিক উদারনীতির ফর্মুলা অনুযায়ী ধনিক শ্রেণী, শিল্প-কৃষির মালিক ও ব্যবসায়ীদের উপর কর বসানো/বাড়ানো চলবে না। তাতে পুঁজি বিনিয়োগ মার খায়। অবশ্য এর ফলে বিনিয়োগ যদি বাড়ত, শিল্প-কারখানা যদি নতুন নতুন হত, তবে খোদ আমেরিকায় কর্মহীন বেকার মানুষের সংখ্যা এ ভাবে আকাশছোঁয়া হত না। ফলে দেখা যাচ্ছে, সংকট থেকে বাঁচতে সমস্ত পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী সরকারগুলো যে সব পদক্ষেপ নিচ্ছে তাতে সংকট আরও বাড়ছে, বেকার বাহিনী বৃদ্ধি পাচ্ছে, শিল্পসংকট তীব্র হচ্ছে।

সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পর পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীরা উন্নয়নের যে রঙীন স্বপ্ন ফেরি করেছিল, তার ফানুস ইতিমধ্যেই ফেটে গেছে। বিশ্বের তাবড় পুঁজিবাদী দেশের আর্থিক সংকট, যা ঋণসংকটের চেহারা নিয়ে সামনে এসেছে তা কিন্তু প্রমাণ করে দিল, পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যেই রয়েছে সংকটের বীজ। পুঁজিবাদের ভক্তরা বলেন, এ সংকট কাটাবার উপায় পুঁজিবাদ নিজেই ঠিক করে নেয়। কিন্তু আজকের বিশ্বজোড়া সংকট ভিন্ন কথা বলছে। সংকট এত গভীর ও তীব্র এবং তার শিকড় এত মূলে যে বেরোবার কোনও রাস্তা পুঁজিবাদ পাচ্ছে না।

বৈষম্য ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে পার্টটাইম অধ্যাপকরা আন্দোলনে

রাজ্যের আংশিক সময়ের অধ্যাপকরা ভয়াবহ বঞ্চনার শিকার। তাঁরা পূর্ণ সময়ের অধ্যাপকদের সমান বা কোনও কোনও ক্ষেত্রে বেশি কাজ করলেও তাঁদের বেতন দেওয়া হয় এক- দশমাংশেরও কম। এদের বেতন কোথাও দৈনিক ১০০ টাকা, কোথাও ৭৫ টাকা। কোথাও দিন হিসাবে নয় ক্লাসভিত্তিক, অর্থাৎ ক্লাস প্রতি সাড়ে দশ টাকা। আবার ছাত্র ভর্তি, প্রশ্নপত্র তৈরি, পরীক্ষা নেওয়া, উত্তরপত্র মূল্যায়ন সহ নানা রকমের প্রশাসনিক কাজ এঁদের দিয়ে করানো হয় যার জন্য কোনও পারিশ্রমিক দেওয়া হয় না। এই বৈষম্য ও বঞ্চনা অবসানের দাবিতেই অধ্যাপকরা রাজপথে নামতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁদের দাবি, পূর্ণ সময়ের অধ্যাপকদের সমান মজুরি দিতে হবে।

রাজ্যে প্রায় সব কলেজেই পূর্ণসময়ের শিক্ষকদের সংখ্যা খুবই কম। বেশ কয়েক বছর ধরে যত শূন্যপদ সৃষ্টি হচ্ছে তার সামান্য অংশে পূর্ণ সময়ের অধ্যাপক নিয়োগ করা হচ্ছে। বাকি সব ক্ষেত্রে নিয়োগ হচ্ছে 'আংশিক সময়ের অধ্যাপক', 'চুক্তিভিত্তিক অধ্যাপক', 'অতিথি অধ্যাপক' ইত্যাদি বিচিত্র নামধারী শিক্ষক। স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি কতখানি অবহেলিত তা বিভিন্ন কলেজের দিকে তাকালেই স্পষ্ট চোখে পড়ে। কলকাতার আশুতোষ কলেজে স্থায়ী শিক্ষক ৭১ জন, অস্থায়ী শিক্ষক ১০৩ জন। সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজে স্থায়ী শিক্ষক ১ জন, অস্থায়ী শিক্ষক ১৬ জন। জেলাগুলিরও একই চিত্র। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া বনমালি কলেজে স্থায়ী শিক্ষক ৩৩ জন, অস্থায়ী শিক্ষক ৮১ জন। দেখা যাচ্ছে, কলেজীয় শিক্ষার মূল ধারা বয়ে নিয়ে চলেছেন এই অস্থায়ী অধ্যাপকরাই। অথচ তাদের না আছে অধ্যাপক হিসাবে প্রাপ্য মর্যাদা, না আছে বাঁচার মতো মজুরি; ন্যায্য মজুরির কথা না হয় বাদই দেওয়া গেল।

পার্টটাইম অধ্যাপকরা আজ জীবনের অভিজ্ঞতায় উপলব্ধি করতে পারছেন, সমাজে বিপুল শিক্ষিত বেকারের সুযোগ নিয়ে সরকার এই নিদারুণ বৈষম্য ও বঞ্চনা চালিয়ে যেতে পারছে, যা অধ্যাপকরা মেনে নিতে পারেন না। গত কয়েকবছর ধরে তাঁরা এই বৈষম্য অবসানের দাবিতে আন্দোলন করছেন। এই আন্দোলনের একটা স্তরে এসে গত ১৭ জুলাই রাজ্য

১৭ জুলাই হাওড়ায় অনুষ্ঠিত রাজ্য কনভেনশন

কনভেনশনের মধ্য দিয়ে তাঁরা গড়ে তুলেছেন তাঁদের নিজস্ব সংগঠন কলেজ অ্যান্ড ইউনিভার্সিটি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন (পিটিটি)। অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অধ্যাপক সুভাষ মালাকার, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক গৌরাঙ্গ দেবনাথ, রাজ্য অফিস সম্পাদক অধ্যাপক মমতা সরকার এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সুপর্ণা দাসগুপ্ত। সংগঠনের নতুন কমিটি ইতিমধ্যে আন্দোলনের কর্মসূচিও ঘোষণা করেছে। কমিটির পক্ষ থেকে বিভিন্ন দাবিতে ১০ আগস্ট এসপ্ল্যানেড মেট্রো চ্যানেলের সামনে অবস্থানের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। দলমত নির্বিশেষে আংশিক সময়ের অধ্যাপকদের একমাত্র সংগ্রামী সংগঠনের দাবি— (১) কর্মরত সমস্ত আংশিক সময়ের শিক্ষকদের পূর্ণ সময়ের কাজের সুযোগ ও মর্যাদা দিতে হবে, (২) দশ বছর বা তার অধিককাল ধরে কর্মরত অধ্যাপকদের জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদান করতে হবে, (৩) ন্যায্য বেতন কাঠামো নির্ধারণ করতে হবে, (৪) অধ্যাপকদের নামে পূর্বে বসানো 'পার্টটাইম' নামক অপমানজনক অভিধা বাতিল করতে হবে।

পার্টটাইম অধ্যাপকরা কয়েক বছরের লাগাতার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত জীবিকার নিরাপত্তার ছাড়পত্র অর্জন করতে পেরেছেন। কিন্তু বাস্তব সত্য হল আজও বহু কলেজ কর্তৃপক্ষ এই সরকারি নির্দেশনামাকে উপেক্ষা করে যাচ্ছেন। ফলে অধিকাংশ অধ্যাপকেরই জীবিকার স্থায়িত্বও মেলেনি।

মুর্শিদাবাদে
মোটরভ্যান চালকদের বিক্ষোভ

মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ান, কান্দি সহ বিভিন্ন ব্লকের প্রায় একশো মোটরভ্যান এক মাসের ওপর আটক করে রেখেছে পুলিশ। সেই ভ্যানচালকরা বৃদ্ধ মা-বাবা, স্ত্রী, সন্তানদের নিয়ে চরম সঙ্কটের মুখে।

অন্যায়ভাবে থানায় আটকে রাখা মোটরভ্যানগুলি অবিলম্বে ছেড়ে দেওয়া, মোটরভ্যান চালকদের উপর পুলিশি জুলুম ও হয়রানি বন্ধ, যাবতীয় মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার, লাইসেন্স প্রদান, পরিবহন শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে ১৫ জুলাই সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়ন মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির উদ্যোগে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা প্রায় দু'হাজার মোটরভ্যান শ্রমিকদের একটি সুসজ্জিত মিছিল প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে জেলাশাসক ও এস পি-র দপ্তরে বিক্ষোভ দেখায়। ডেপুটেশন দিতে গেলে জেলাশাসকের অনুপস্থিতিতে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট প্রতিনিধিদের বলেন, আটক সমস্ত মোটরভ্যানগুলিকে অবিলম্বে ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে দাবিগুলি তুলে ধরা হবে। প্রতিনিধি দলে ছিলেন এ আই ইউ টি ইউ সি-র জেলা সম্পাদক কমরেড সুখেন্দু সেনগুপ্ত, সহসভাপতি সামসুল আলম, যুগ্ম সম্পাদক গোলাম মোর্তুজ, ভরত দাস। এস পি-র অনুপস্থিতিতে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অপর একটি প্রতিনিধি দলের ডেপুটেশন গ্রহণ করে। জেলার সমস্ত থানায় আটক মোটরভ্যানগুলিকে অবিলম্বে ছেড়ে দেওয়ার জন্য তিনি ফোন করে নির্দেশ দেন। সেখানে প্রতিনিধি দলে ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস, এ আই ইউ টি ইউ সি-র জেলা সভাপতি কমরেড আব্দুস সঈদ, সহসভাপতি কমরেড আনিসুল আম্বিয়া, যুগ্ম সম্পাদক কমরেড রবিউল হক। পুরনো কালেকটরেটের সামনে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কমরেডস অশোক দাস, সুখেন্দু সেনগুপ্ত।

গোসানীমারীতে মহিলা সম্মেলন

কোচবিহারের গোসানীমারীতে অল ইন্ডিয়া এম এস এস-এর আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১০ জুলাই। সম্মেলনে এস ইউ সি আই (সি)-র আঞ্চলিক সম্পাদক কমরেড অনিল চন্দ্র বর্মন, এমএসএস-এর জেলা কমিটির সদস্য কমরেড হিরণ রায়, লোকাল সম্পাদিকা কমরেড রীনা রায় বক্তব্য রাখেন। নারী নির্যাতন, নারী ও শিশুপাচার, মদ, জুয়া ও অশ্লীলতার বিরুদ্ধে তাঁরা আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। এ ছাড়াও তামাক, পাটসহ কৃষিপণ্যের ন্যায্য দামের দাবি জানান। কমরেড জলেশ্বরী বর্মন ও কমরেড রীনা রায়কে যথাক্রমে সভানেত্রী ও সম্পাদিকা নির্বাচিত করে ১২ জনের গোসানীমারী আঞ্চলিক কমিটি গঠিত হয়।

কালো টাকার রমরমা

তিনের পাতার পর

চেয়ারম্যানের মুখে এই যুক্তিই শোনা গেছে। তিনি বলেছেন, ঘুষ দেওয়াকে আইনসিদ্ধ করে দিলে দুর্নীতি বন্ধ করা যাবে। বুর্জোয়া অর্থনীতির নিয়মের মধ্যেই যে দুর্নীতি এবং কালো টাকা জন্মানোর বীজ নিহিত আছে তা গোপন করতেই এই ধরনের ছেঁদো যুক্তি করা হচ্ছে।

ভারতীয় পুঁজিবাদ অবশ্য জন্মলগ্ন থেকেই দুর্নীতিগ্রস্ত। জাতীয় পুঁজিবাদী অর্থে দেশপ্রেম ইত্যাদি যা ইউরোপ বা আমেরিকায় পুঁজিবাদের মধ্যে দেখা যায়, ভারতীয় পুঁজিবাদে তা সূচনা থেকেই কার্যত অনুপস্থিত। বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন যে, পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোতে ব্যবসায়ীরা শিশুখাদ্যে ভেজাল দেওয়ার কথা ভাবতে পারেন; ভেজাল ওষুধ বিক্রি করতে পারেন, যা এদেশে অনায়াসে চলে। পুঁজিবাদের প্রতিক্রিয়াশীল যুগে ভারতীয় পুঁজিবাদের ক্ষমতায় আরোহন ঘটার ফলে জাতীয় চেতনার দুর্বলতা গোড়া থেকেই রয়েছে। আজ পুঁজিবাদী অর্থনীতি যত মরণোন্মুখ হবে, বাজার সংকট যত বাড়বে, ততই ব্যক্তি শিল্পপতি বা ব্যবসায়ী তার নিজের টিঁকে থাকার জন্য অন্যকে প্রতিযোগিতার বাজার থেকে সরিয়ে দিতে চাইবে এবং এর জন্য যে কোনও রকমের নীতিহীন পথ সে নিতে দ্বিধা করবেনা। রাস্তাতেই আজকের পুঁজিবাদ সর্বত্র দুর্নীতির জন্ম দিচ্ছে, কালো টাকার জন্ম দিচ্ছে। প্রচুর অর্থের লোভ যা আজকের মৃতপ্রায় পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্য তা থেকেই কালো টাকা তৈরি হচ্ছে। তাই আমরা দেখি আজ ঘুষ দেওয়া বা নেওয়া যে অপরাধ বা নীতিহীন কাজ, তা ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। খুব সূক্ষ্মভাবে পুঁজিবাদী সমাজের প্রতিটি প্রতিষ্ঠান এই বার্তা ছড়াচ্ছে যে, এ ছাড়া কোনও উপায় নেই। এতে হাতছানি দিচ্ছে প্রচুর অর্থের মালিকরা, তারা সবরকমের বেআইনি অনৈতিক পথে তাদের ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি ঘটাচ্ছে, কালো টাকার পাহাড় জমাচ্ছে। আর বঞ্চিত শোষিত হচ্ছে খেটে খাওয়া নব্বই শতাংশ মানুষ। চূড়ান্ত শোষণে জর্জরিত মানুষ কালো টাকার দৌরাত্ম্যে ঘটা ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধির বাজারে না খেয়ে বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে। হিসাব করে দেখা গেছে যে, বিশ্বের ৫৭ শতাংশ সম্পদ যা কালো টাকার স্বর্গরাজ্যে জমা আছে তা ভোগ করছে জনসংখ্যার মাত্র ১ শতাংশ।

সংসদীয় সরকারি দলগুলির ভূমিকা

দুর্নীতি এবং কালো টাকা সম্পর্কিত অভিযোগ কেন্দ্রীয় সরকারকে বর্তমানে কিছুটা বেকায়দায় ফেলেছে। সাধারণ মানুষ যারা দেশের অর্থনীতিকে 'আদার ব্যাপারী হয়ে জাহাজের কারবারে নাক গলিয়ে কী হবে' মনোভাব থেকে বহু দূরের জিনিস মনে করে, তাদের মনেও প্রশ্ন জাগছে, এত দুর্নীতি, এত কালো টাকা নিয়ে অভিযোগ, অথচ সরকার কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ নিচ্ছে না কেন? বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে সরকারি বেসরকারি সভায় দেশের শাসক দলের নেতা মন্ত্রীরা কালো টাকা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে তারা কত সোচ্চার তা প্রচার করছে, অথচ বাস্তবে তার কোনও ফলাফল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

সুপ্রিম কোর্টের ভর্ৎসনাতেও সরকার কর্ণপাত করছে না। এদের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবস্থাও নিচ্ছে না। সুপ্রিম কোর্টের অভিমত, বিষয়টি শুধুমাত্র কর ফাঁকির সাথে যুক্ত করে দেখলে চলবে না, এটা দেশের সম্পদ লুটের সামিল। দেখতে হবে এই টাকার উৎস কী, মাদক পাচার বা চোরাচালান, বেআইনি অস্ত্রব্যবসা, বিভিন্ন ধরনের বেআইনি কার্যকলাপের সাথে এই অর্থ জড়িয়ে আছে। আসলে খালি চোখেই এগুলি এখন মানুষ দেখতে পাচ্ছে। ফলে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার প্রতি মানুষের মোহভঙ্গ হচ্ছে। ফলে এই চূড়ান্ত দুর্নীতিপরায়ণ শোষণমূলক ব্যবস্থাকে টিঁকিয়ে রাখার জন্য পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থারই এক প্রতিষ্ঠান অন্য প্রতিষ্ঠানকে সতর্ক করে দিচ্ছে। জনরোষের চাপেই বিচার ব্যবস্থা আজ যতটুকু দুর্নীতির বিরুদ্ধে না বললে নয়, ততটুকুই বলছে। সরকার ও বিচার ব্যবস্থার মধ্যে এ নিয়ে ঠেলাঠেলিই চলবে, কাজের কাজ একবিন্দু হবে না। এ অতীতেও দেখা গেছে। তাই কেন্দ্রীয় সরকার নাম প্রকাশ নিয়ে টালবাহানা করে বাস্তবে কালো টাকার কারাবারীদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। কারণ তাহলে ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে। বিজেপি পরিচালিত এন ডি এ, কংগ্রেস-সিপিএমের যৌথ প্রথম ইউ পি এ বা বর্তমান ইউ পি এ সরকার কেউই সরকারি তখ্তে থাকার সময় এ নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করেনি, করছেও না। বিরোধী অবস্থানে থাকলে এরা ভোট রাজনীতিতে ফায়দা তোলার স্বার্থে হৈ চৈ করে সংসদে গলা ফাটায়, যেমন বর্তমানে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কালো টাকা উদ্ধার নিয়ে বিজেপি, সিপিএম চীৎকার করে রাজনীতির ময়দান মাত করতে চাইছে। যদিও বিজেপি বর্তমানে কর্ণাটকে তাদের পরিচালিত ইয়েদুরাপ্পা সরকারের খনি দুর্নীতিতে একটু কোণঠাসা। বেআইনি কার্যকলাপে যুক্ত থেকে কালো টাকা অর্জন এবং বেনামে তা রক্ষা করা, বিদেশে পাচার করে সাদা টাকা করা বা দেশেই ঐ কালো টাকা বেআইনি কার্যকলাপে বিনিয়োগ করে আরও কালো টাকা উপার্জন করাতে এরা কেউই পিছিয়ে নেই। ফলে, কোনও সরকার আসলে চায় না কালো টাকা উদ্ধার হোক। কালো টাকার মালিকরা স্বেচ্ছায় তাদের নামের তালিকা সরকারের হাতে তুলে দেবে বলে দাবি করছে সরকার। এটাও আসলে সত্যিকারের কোনও কঠোর পদক্ষেপ না নিয়ে মানুষকে ঠকানো এবং মানুষের দৃষ্টিকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেবার ঘৃণ্য চক্রান্ত। সরকার কোটি কোটি টাকায় পোষা গোয়েন্দা বিভাগ রেখে দিয়েছে কেন? কেনই বা তাদের এই ব্যাপারে কাজে লাগাচ্ছে না। আসলে সরকার কোনও কালো টাকার মালিককে ধরতে চায় না। কারণ বর্তমান সরকার চলছেই একচেটিয়া পুঁজিপতি কালো টাকার মালিকদের দ্বারা। সরকার শুধুমাত্র এদের আবেদন-নিবেদন করে সময় দিতে পারে, যাতে এরা দ্রুত তাদের কালো টাকা সাদা করে নিতে পারে। এর জন্য ১৯৬০ সাল থেকে পর পর সরকার ৬টি 'স্বেচ্ছায় নাম প্রকাশের' পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এর মধ্যে দিয়ে বিপুল পরিমাণ কালো টাকার মাত্র এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ সরকার উদ্ধার করতে পেরেছে। আর এটাকেই সরকার নির্লজ্জভাবে তার বিরাট জয় বলে দেখিয়েছে। পাশাপাশি সেইসব কালো টাকার মালিককে সমাজের চোখে দেশপ্রেমিক সাজিয়েও প্রচার করা হয়েছে। যেমন টুজি টেলিকম কেলেঙ্কারিতে যুক্ত টাটাকে সযত্নে আড়ালে রাখছে সরকার। আম্বানিরা চরম অসদুপায়ে বিপুল সম্পদের মালিক হয়েও এখন দেশের একনম্বর শিল্পপতি ও 'দেশপ্রেমিকও' বটে। ফলে কালো টাকা, ঘুষ-দুর্নীতি ইত্যাদি কোনও বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়। ভারতের পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা, সরকার, প্রশাসন সব কিছুর সাথে তা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। এসব একইরকম রেখে ঘুষ-দুর্নীতি-কালো টাকা ইত্যাদি থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব।

কিউবার চিকিৎসা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে চায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ

যে কোনও অজুহাত তুলে ওবামা নেতৃত্বাধীন আমেরিকা, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং ন্যাটোর যুদ্ধবাজ জোটের বিশ্বের সর্বত্র, বিশেষত সামরিকভাবে দুর্বল দেশগুলোতে আগ্রাসন চালানো এখন প্রায় নিত্য ঘটনা। গত শতকের পাঁচের দশকে ভিয়েতনাম ও কোরিয়ায় আগ্রাসনের মধ্য দিয়ে তাদের অভিযান শুরু হয়েছিল। কিন্তু সোভিয়েত নেতৃত্বাধীন শক্তিশালী বিশ্বসমাজতান্ত্রিক শিবিরের উপস্থিতি ও তার সাহায্য ও সমর্থনে দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের অগ্রযাত্রা সাম্রাজ্যবাদকে পিছু হটতে বাধ্য করেছিল। দুঃখের বিষয়, সোভিয়েত সহ পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতন ও তার ফলে সমাজতান্ত্রিক ও জোটনিরপেক্ষ এই দুই যুদ্ধবিরোধী শিবিরের অবলুপ্তি এবং চীনে প্রতিবিপ্লবের মাধ্যমে পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠার সুযোগে যুদ্ধবাজরা এখন আর কোনও আন্তর্জাতিক রীতিনীতিরই তোয়াক্কা করছে না। তাদের স্বার্থরক্ষাকারী রাষ্ট্রসংঘকে শিখণ্ডী করে যখন যে দেশে তারা প্রয়োজন মনে করছে, সেখানে একতরফা ঘোষণা করে দিচ্ছে যে, সে দেশে গণতন্ত্র বা মানবাধিকার নেই, সে দেশের শাসকরা সন্ত্রাসবাদে মদত দিচ্ছে অথবা গণহত্যা চালাচ্ছে। আর এই অজুহাতে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের স্বনিযুক্ত রক্ষাকর্তা হয়ে তারা সেই শাসকদের অবিলম্বে পদত্যাগ করতে নির্দেশ দিচ্ছে, অন্যথায় নির্লজ্জ আগ্রাসন চালিয়ে, যুদ্ধবিমান থেকে বোমা বর্ষণ করে সে দেশের নাগরিকদের নির্বিচার হত্যা ও ধ্বংসলীলার গণতন্ত্র তারা চর্চা করছে। এমনকী সেই দেশ দখল করে রাষ্ট্রনায়কদের হত্যা করে নিজেদের পুতুল সরকার বসিয়ে সেই দেশগুলোকে নিজেদের অবাধ লুঠের বাজারে পরিণত করছে। এইভাবে তারা দখল করেছে ইরাক। ধ্বংস করেছে আফগানিস্তান, সোমালিয়া, হাইতির মতো দেশ। তাদের সাম্প্রতিকতম শিকার মধ্যপ্রাচ্যের ছোট্ট দেশ লিবিয়া। পরবর্তী টার্গেট ইরান। এরা এতদূর বেপরোয়া হয়ে উঠেছে যে, ইরান আক্রমণের পরিকল্পনা নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন মদতপুষ্ট যুদ্ধবাজ ইজরায়েলের সঙ্গে প্রকাশ্যেই আলোচনা চালাচ্ছে।

'অবাধ্য' দেশগুলোকে শায়েস্তা করতে মানবাধিকারের স্বঘোষিত চ্যাম্পিয়ন আমেরিকার আর একটা অস্ত্র হল বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা জারি করে সে দেশকে মার্কিন শর্তের সামনে নতজানু করাতে চেষ্টা করা। এই আক্রমণে দীর্ঘদিন ধরে জর্জরিত ছোট্ট সমাজতান্ত্রিক দেশ কিউবা। এদের একমাত্র অপরাধ, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিশ্বব্যাপী বিপর্যয়ের পরেও মনোবল না হারিয়ে এমনকী আমেরিকার ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে অবস্থান করা সত্ত্বেও তারা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দৃঢ় অবস্থান বজায় রেখে সমাজতন্ত্রের পথে চলছে। এ হেন অবাধ্য কিউবানদের শিক্ষা দিতে আমেরিকা সে দেশে আরও বহুরকম জিনিসের সঙ্গে অত্যাবশ্যক ওষুধ রপ্তানিতেও নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। শুধু তাই নয়, এইডস, ম্যালেরিয়া ও টিবির মতো মারণরোগ প্রতিরোধ করার জন্য রাষ্ট্রসংঘের তহবিল থেকে কিউবার জন্য বরাদ্দ করা ৪.২০৭ মিলিয়ন ডলারের বরাদ্দ অর্থ গত জানুয়ারি মাসে আমেরিকা আটকে দিয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কিউবার সরকার শুধু নিজের দেশের ৫০০০-এর বেশি এইচ আই ভি রোগীদের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসা করে তাই নয়, লাতিন আমেরিকা ও তৃতীয় বিশ্বের আরও ১০০টির বেশি দেশে ছড়িয়ে থাকা প্রায় ৪০,০০০ কিউবান স্বাস্থ্যকর্মীদের মাধ্যমে বিদেশি নাগরিকদেরও যথাসম্ভব চিকিৎসা পরিষেবা দেয়। মার্কিন বুটের তলায় নিষ্পেষিত প্রতিবেশী দরিদ্র দেশগুলোর প্রতি এই সহযোগিতামূলক মনোভাবের জন্য গোটা দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের জনসাধারণ কিউবাকে ভালোবাসে ও শ্রদ্ধা করে। এই কারণে আমেরিকার কিউবাবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে এইসব দেশেও জনমত প্রবল। বিশ্বের উন্নত অনুন্নত সব পুঁজিবাদী দেশেই যখন চিকিৎসাকে কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় ধনীর ক্রয়যোগ্য একটি ব্যয়বহুল পণ্যে পরিণত করা হয়েছে, সেখানে আমেরিকার নাকের ডগায় বসে বাজার অর্থনীতিকে অগ্রাহ্য করে চিকিৎসাকে রাষ্ট্রের একটি অবশ্যপালনীয় দায়িত্ব হিসাবে গ্রহণ করা এবং সেই দায়িত্ব আর্থিক দিক থেকে দুর্বল ছোট্ট দেশও পালন করতে পারে, যদি তারা সমাজতান্ত্রিক আদর্শে পরিচালিত হয় — এমন একটা 'ভয়ানক' সত্যকে সপ্রমাণ করছে কিউবা। অতএব 'মানবাধিকার' এবং 'গণতন্ত্রের' মার্কিন অস্ত্র তাদের ওপর প্রয়োগ করা হবে বৈকি!

তৃতীয় বিশ্বের অন্যত্র, বিশেষত, লাতিন আমেরিকার দেশগুলোতে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করার কিউবান নীতির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতেও আমেরিকা চেষ্টার কসুর করছে না। 'কমফর্ট' নামে ১০০০ শয্যা এবং ১২টি অপারেশন থিয়েটার সংবলিত একটি বিশাল হাসপাতাল জাহাজ তৈরি করেছে তারা। বেলিজ, গুয়াতেমালা, পানামা, এল সালভাদর, পেরু, ইকুয়েডর, কলম্বিয়া, নিকারাগুয়া, হাইতি প্রভৃতি লাতিন আমেরিকার দেশগুলোর বন্দর শহরগুলোতে ঘুরে ঘুরে কমফর্ট বিনামূল্যে হাজার হাজার অপারেশন করেছে বলে আমেরিকার দাবি। অথচ তার দেশের গরিব জনসাধারণ উপযুক্ত চিকিৎসা পরিষেবার অভাবে আর্তনাদ করছে। মজার ব্যাপার হল 'ইন্টার আমেরিকান ডায়ালগ' নামে ওয়াশিংটনের একটি আমেরিকাপন্থী গবেষণা সংস্থার সভাপতি পিটার হাকিম মন্তব্য করেছেন যে, এইভাবে কিউবারই নকল করে আমেরিকা কিউবাকে রুখতে পারবে না। কারণ, কিউবার ডাক্তাররা জাহাজে করে এসে বন্দরশহরে দু'দিন থেকে কিছু চিকিৎসা করে আবার দেশে ফিরে যাচ্ছেন না। তাঁরা ওইসব দেশে বছরের পর বছর ধরে বাস করে দেশবাসীর আপনজন হয়ে উঠছেন।

শত্রু দেশের বিরুদ্ধে অনর্গল মিথ্যা প্রচারের মার্কিন ঐতিহ্যও বিশ্বে সুবিদিত। কিউবার জনমুখী স্বাস্থ্যনীতির বিরুদ্ধে সেই অস্ত্রও তারা প্রয়োগের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। ভারতীয় রাজনীতিকদের কালো টাকা সম্পর্কিত তথ্য ফাঁস করে সুপরিচিত উইকিলিকস এই চক্রান্ত বিষয়েও মার্কিন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের একটা তথ্য সম্প্রতি ফাঁস করেছে। ২০০৬ সালের জুলাই মাসে কিউবার রাজধানী হাভানায় জোটনিরপেক্ষ সম্মেলন চলাকালীন সেখানকার মার্কিন স্বাস্থ্যবিভাগের মাইকেল পার্মলি একটি নোটে জানিয়েছিলেন যে, কিউবার চিকিৎসা ব্যবস্থার সুনাম ধ্বংস করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের গল্প ফাঁদা যেতে পারে এমন খবর তিনি খুঁজছেন। উইকিলিকসেরই ফাঁস করা আরও একটি তথ্য জানিয়েছেন মাইকেল মুর। তিনি মার্কিন স্বাস্থ্যনীতির সমালোচনা ও কিউবার স্বাস্থ্যনীতির প্রশংসা করে সিকো নামে একটি তথ্যচিত্র তৈরি করেন। কিউবায় ছবিটি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে। এমনকী হাভানার ইনস্টিটিউটে এই ছবিটির একটি প্রিন্টও রক্ষিত হয়। কিন্তু হাভানায় অবস্থিত মার্কিন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের এক অফিসার এ বিষয়ে সম্পূর্ণ মিথ্যা একটি গল্প রচনা করে দেশে পাঠান। তিনি বলেন যে, 'কিউবা সরকার 'সিকো'কে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। কেননা, ছবিটিতে কিউবার স্বাস্থ্যব্যবস্থার এমন এক অতিরঞ্জিত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে যে, যেসব সুযোগ সুবিধে জনসাধারণ আদৌ পায় না, সেইগুলো দেওয়া হয় বলে ছবিতে তারা যদি দেখে তাহলে তারা সত্যসত্যই সেগুলো পাওয়ার দাবি করবে এবং সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে।'

শুধু মিথ্যা প্রচার এবং আন্তর্জাতিক সাহায্য আটকে দেওয়াই নয়, মার্কিন সরকার কিউবায় অত্যাবশ্যক ওষুধ এবং শিশুদের অ্যানেস্থেসিয়ার জন্য বহুল ব্যবহৃত সোভোফ্লুরিন, বয়স্কদের অপারেশনের জন্য অত্যাবশ্যক ডেক্সমেটোমাইডিন রপ্তানির ওপরেও নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। এই দুটো ওষুধেরই প্রস্তুতকারক আমেরিকান সংস্থা অ্যাবট ল্যাবরেটরিস। অন্য একটি আমেরিকান সংস্থা মার্ক অ্যান্ড কোং সরকারি নিষেধাজ্ঞার জন্য শিশুদের লিম্ফোরাসটিক লিউকোমিয়ার ওষুধ এলসপার কিউবাকে বিক্রি করতে অস্বীকার করেছে। মার্কিন সরকার এমনকী সে দেশের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'প্যাসটর ফর পিস ক্যারাভ্যান'কে কিউবাকে অ্যাম্বুলেনস দান করারও অনুমতি দেয়নি।

এখানেই শেষ নয়, কিউবার চিকিৎসা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে আমেরিকা এতই মরিয়া হয়ে উঠেছে যে কিউবার চিকিৎসকরা যাতে সর্বাধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না হতে পারে সে জন্য আমেরিকায় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন মেডিক্যাল কনফারেন্সে যোগদানে ইচ্ছুক কিউবার চিকিৎসকদের ভিসা পর্যন্ত মার্কিন সরকার আটকে দিয়েছে। আবার শয়তানি করে একই সঙ্গে 'কিউবান মেডিক্যাল প্রফেশনাল প্যারোল' নামে একটি অভিবাসন প্যাকেজ তারা ঘোষণা করেছে যার মাধ্যমে বিদেশে কর্মরত কিউবান চিকিৎসকদের আহ্বান করা হয়েছে যে, তারা যদি স্বদেশের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিজেদের শরণার্থী বলে ঘোষণা করে আমেরিকায় প্রবেশ করে তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাদের বসবাস ও কাজ করার ভিসা দেওয়া হবে।

ভারতবাসী হিসেবে আমাদের লজ্জা যে ভারত সরকার নিজেদের বৃহৎ শক্তি বলে দাবি করে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্য হওয়ার দাবি জানায়, কিন্তু ছোট্ট দেশ কিউবার বিরুদ্ধে বিশ্ব মানবাধিকার রক্ষার স্বনিযুক্ত অভিভাবকদের এই নৃশংস আক্রমণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় না, ভারতীয় প্রতিনিধিকে কখনও রাষ্ট্রসংঘে টুঁ শব্দটুকুও উচ্চারণ করতে শোনা যায় না। সে বিষয়ে তারা দেশের জোটনিরপেক্ষ ও শান্তিকামী ঐতিহ্যকে দু'পায়ে মাড়িয়ে আজ যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদীদেরই সঙ্গে দহরম মহরম করে চলেছে, বিশ্বজোড়া শান্তিকামী মেহনতি মানুষের সামনে ভারতীয় ঐতিহ্যকে কালিমালিপ্ত করছে। এর বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী প্রতিটি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে সোচ্চার হতে হবে।

কমসোমলের শিক্ষাশিবির

মুর্শিদাবাদ

১৬-১৭ জুলাই কিশোর কমিউনিস্ট সংগঠন কমসোমলের জেলা শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হয় মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলায়। দেড় শতাধিক প্রতিনিধি প্রথমে শহর পরিক্রমা করে। রক্তপতাকা উত্তোলন ও শহিদ বেদিতে মাল্যদান করে শিক্ষাশিবিরের সূচনা করেন এস ইউ সি আই (সি) মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদক কমরেড সাধন রায় এবং প্রারম্ভিক আলোচনা করেন এস ইউ সি আই (সি)-র বিশিষ্ট সংগঠক কমরেড সান্টু গুপ্ত। প্রতিনিধিরা গান, আবৃত্তি, নাটক, আলোচনা এবং মাঠে প্যারেড, পিটি, ফুটবল, কবাডি, খো খো খেলায় অংশগ্রহণ করে। উপস্থিত ছিলেন কমসোমলের রাজ্য ইনচার্জ অরুণ জানা ও দলের মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যা কমরেড খাদিজা বানু। শেষে কমরেড আব্দুল মাবুদ নয়নকে পুনরায় ইনচার্জ করে ২৮ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

দার্জিলিং

কিশোর কমিউনিস্ট সংগঠন কমসোমলের দার্জিলিং জেলা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয় ৯-১০ জুলাই ফুলবাড়ি হাইস্কুলে। ১৫০ জন প্রতিনিধি এই ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করে। ক্যাম্প পরিচালনা করেন এস ইউ সি আই (সি) দার্জিলিং জেলা সম্পাদক কমরেড গৌতম ভট্টাচার্য। শহিদ বেদিতে মাল্যদান করেন কমসোমল-এর পূর্বতন রাজ্য ইনচার্জ কমরেড অঞ্জনাভ চক্রবর্তী, বর্তমান রাজ্য ইনচার্জ কমরেড অরুণ জানা, দলের বাতাসি আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক কমরেড জয় লোধ। শিবিরে পিটি, প্যারেড, ফুটবল ও অন্যান্য খেলা হয়। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান, আবৃত্তি, মূকাভিনয় এবং নাটক মঞ্চস্থ হয়। বক্তব্য রাখেন কমরেডস গৌতম ভট্টাচার্য, অঞ্জনাভ চক্রবর্তী। শিবির থেকে ১৯ জনের জেলা সংগঠনী কমিটি গঠিত হয়।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ফুলচাষিদের ডেপুটেশন

সাম্প্রতিক অতি বর্ষণ ও বন্যায় পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া, নদিয়া, দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগণার ক্ষতিগ্রস্ত ফুলচাষিদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবিতে সারা বাংলা ফুলচাষি ও ফুল ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে ১৩ জুলাই রাজ্যের হর্টিকালচার দপ্তরের মন্ত্রীকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। প্রতিনিধি দলে ছিলেন সমিতির সম্পাদক নারায়ণচন্দ্র নায়ক, সহসম্পাদক অশোক গিরি, চণ্ডী সেনাপতি। মন্ত্রী জেলাগুলির আধিকারিকদের কাছ থেকে অবিলম্বে রিপোর্ট সংগ্রহ করে দপ্তরের প্রধান সচিবকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেন।

উত্তরপ্রদেশে আশা কর্মীদের সমাবেশ

উপযুক্ত বেতন সহ অন্যান্য দাবিতে ২৬ জুলাই কানপুরে আশা কর্মীদের বিক্ষোভ

রাজগ্রাম পঞ্চায়েতে বিক্ষোভ, ঘেরাও

পানীয় জল সরবরাহ, রেশন কার্ড প্রদান, পঞ্চায়েতের দলবাজি ও দুর্নীতি বন্ধ করার দাবিতে এবং বিপিএল তালিকায় থাকা ৪০টি পরিবারের নাম বাতিলের প্রতিবাদে ৮ জুলাই বীরভূমের মুরারই থানার রাজগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) রাজগ্রাম ইউনিটের সদস্যরা। এতে দুই শতাধিক মানুষ অংশগ্রহণ করেন। প্রবল বিক্ষোভের চাপে পঞ্চায়েত প্রধান দাবিগুলি সমাধানের আশ্বাস দিলে ঘেরাও তুলে নেওয়া হয়। স্থানীয় মানুষেরা জানান, দাবিগুলি সমাধানে পঞ্চায়েত কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে আগামী দিনে পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে যে কোনও আন্দোলনে অংশ নেবেন। প্রধানের সাথে আলোচনায় অংশ নেন কমরেডস রফিকুল হাসান, ব্রজমোহন দাস, রবিউল সেখ, আনসারুল শেখ, সাজাহান সেখ, ওলি খান প্রমুখ।

R.N.I. No 5268 / 60
Postal Registration No. KOL / RMS / 138 / 2010-12

শিশু খুনের প্রতিবাদে রঘুনাথপুরে মৌন মিছিল

২২ জুলাই রঘুনাথপুর শহরের ছোট্ট শিশু তমালিকা দেওঘরিয়াকে ঠাণ্ডা মাথায় পৈশাচিকভাবে খুন করা হয়। এই ধরনের অমানবিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন না হয়, তার জন্য গঠিত হয় 'নাগরিক সুরক্ষা কমিটি'। কমিটির উদ্যোগে ২৫ জুলাই এক মৌন মিছিল রঘুনাথপুর শহর পরিক্রমা করে। পরে মহকুমা শাসকের নিকট ডেপুটেশন দেওয়া হয়। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন তমালিকার পরিবারের আত্মীয়স্বজন এবং শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। মিছিলে মহিলাদের অংশগ্রহণ ছিল লক্ষণীয়।

অবিলম্বে দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং শিশু পাচারকারীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানানো হয়। এ ছাড়াও স্বপন দে নামে এক ব্যক্তির ওপর থেকে সমস্ত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারেরও দাবি তোলা হয়। মৌন মিছিলে নেতৃত্ব দেন আহ্বায়ক কালাচাঁদ চ্যাটার্জী, ডাঃ তিমির ঘোষাল, মুরলি বরাট, দেবাশিস সরখেল, লক্ষ্মীনারায়ণ সিন্‌হা প্রমুখ।

পূর্ব মেদিনীপুরের নাম পরিবর্তনের প্রস্তাবের বিরোধিতায় নাগরিকরা

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নাম পরিবর্তনের প্রস্তাবের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন সেখানকার নাগরিক সমাজ। ২৬ জুলাই কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক নাগরিক সভায় এ জন্য সোচ্চার হন গৌতম বাগ (আই এ এস), অধ্যাপক প্রণবেশ জানা, অধ্যাপক সুব্রত পাণ্ডা, অধ্যাপক নিতাই চন্দ্র মণ্ডল, অধ্যক্ষ প্রণব কুমার চ্যাটার্জী, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক অশোক মাইতি, শিক্ষক তপন সামন্ত, সমাজসেবী বিমল জানা, স্নেহাশিস দাস, শুভাশিস দাস প্রমুখ। সমস্ত বক্তার মূল কথা হল, শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাধীনতা আন্দোলন ও স্বাধীনোত্তরকালে গণআন্দোলনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে এই মেদিনীপুর জেলা। 'মেদিনীপুর' নামের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বিদ্যাসাগর, রানি শিরোমণি, ক্ষুদিরাম, মাতঙ্গিনী, হেমচন্দ্র, বিমল দাশগুপ্ত, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, সতীশ সামন্ত, সুশীল ধাড়া, অজয় মুখার্জী, বিশ্বনাথ মুখার্জী প্রমুখ অসংখ্য বিপ্লবী ও স্বাধীনতা সংগ্রামীর নাম। স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে মেদিনীপুর জেলার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। অসংখ্য বিপ্লবীর জন্ম দিয়েছে এই জেলা। নাম পরিবর্তনের ফলে আপসহীন প্রতিবাদী মানসিকতার ঐতিহ্যবাহী মেদিনীপুর শব্দটি থেকে পূর্ব মেদিনীপুরবাসীদের বঞ্চিত করা হবে ও তাঁদের ভাবাবেগে প্রবলভাবে আঘাত করা হবে। বাস্তবে তাঁরা গৌরবময় পূর্বসূরীদের ইতিহাস থেকে ছিন্নমূল হয়ে পড়বেন।

নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে এক প্রচারপত্রে বলা হয়েছে, বিগত সিপিএম সরকার যখন মেদিনীপুর জেলা ভাগ করে তখন জেলার বহু মানুষ এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেনি। জেলা ভাগের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করার জন্য তাঁরা সরকারের কাছে বার বার দাবি জানিয়েছিলেন। কিন্তু সরকার কর্ণপাত করেনি। বর্তমান সরকার সেই পথই অনুসরণ করছে। ১ আগস্ট মেদিনী সংসদ, মেদিনীপুর সম্মিলনী, প্রবাসী খেজুরি ও মেদিনীপুর জেলা সম্মেলনের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর সি এ-র কাছে গণস্বাক্ষর সংবলিত স্মারকলিপি দেওয়া হয়। আগামী ২০ আগস্ট মহাবোধি সোসাইটি হলে এক নাগরিক সভার আয়োজন করা হয়েছে।

প্রকাশিত হয়েছে
কমরেড
শিবদাস ঘোষের বই
নির্বাচন সর্বস্ব রাজনীতি নয়
বিপ্লবী
আন্দোলনই
মুক্তির পথ

বাঙ্গুর হাসপাতালে অব্যবস্থার প্রতিবাদ

১৮ জুলাই হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালের সুপারকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। কমিটির প্রতিনিধিরা জানান, একটি স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ২৪ ঘণ্টা ইসিজি, এক্স-রে খোলা থাকে না, সি টি স্ক্যান মেসিন নেই, আউটডোর-ইনডোরে ডাক্তাররা নিয়মিত উপস্থিত থাকেন না, কল্যাণ তহবিলের সাহায্য গরিব রোগীরা পান না, দুর্নীতি ও দালালচক্রে হাসপাতাল ছেয়ে আছে। এগুলি প্রতিকারের দাবি নিয়ে সুপারের সাথে আলোচনা হয়। দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে তিনি জানান সমস্ত বিষয়গুলো সমাধানের জন্য তিনি চেষ্টা চালাবেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির কলকাতা জেলার যুগ্ম সম্পাদক আশিস রায়চৌধুরী, রুনা পুরকায়েত, পিন্টু মাইতি, বাপী ঘোষ, পার্থ বণিক, স্বপ্না দাশগুপ্ত, শেখ গোলাম, ডলি মজুমদার, শীলা ঘোষ প্রমুখ।

যাদবপুর টি বি হাসপাতাল ধ্বংসের মুখে
বলল জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি

কলকাতার যাদবপুরে কে এস রায় টিবি হাসপাতাল, যা বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের রেজিস্ট্যান্ট টি বি চিকিৎসার মাত্র দু'টি হাসপাতালের মধ্যে অন্যতম, তা সরকারের জনবিরোধী স্বাস্থ্যনীতির ফলে ও চূড়ান্ত অবহেলায় আজ ধ্বংসের মুখে।

এ বিষয়ে হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির রাজ্য সম্পাদক ডাঃ অশোক সামন্ত জানান, পূর্বতন রাজ্য সরকার জনগণের টাকায় তৈরি টিবি হাসপাতালটির সম্পূর্ণ জমি বেআইনিভাবে কেপিসি মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষকে মাত্র ১ টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছে। তখন অবশ্য তারা বলেছিল, হাসপাতালটি সরকারেরই থাকছে। কিন্তু বর্তমানে টিবি হাসপাতালের মেডিকেল সুপার জানিয়েছেন, হাসপাতাল সহ সমস্ত জমিই হস্তান্তরিত হয়ে গিয়েছে। ফলে রাজ্যের একমাত্র মাল্টি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিবির চিকিৎসা কেন্দ্রটি ধ্বংস হতে বসেছে। অথচ টিবি হাসপাতাল অধিগ্রহণ বিল, ১৯৭৯-তে বলা হয়েছিল, ঐ জমিতে কেবলমাত্র টিবি হাসপাতালই তৈরি করা যাবে।

হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি ১৩ জুন মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে পাঠানো দাবিপত্রে হাসপাতালটিকে বক্ষরোগের সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পরিণত করার যে দাবি জানিয়েছিল, সে সম্পর্কে তারা আবার মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করেছে।

শিক্ষক নিয়োগে অন্যায় শর্তের প্রতিবাদে কৃষ্ণনগরে বিক্ষোভ

শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিএড ডিগ্রি এবং ৫০ শতাংশ নম্বর আবশ্যিক করার কেন্দ্রীয় সরকারি ফরমানের ফলে স্নাতক হওয়া ৭৫ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী এস এস সি পরীক্ষায় বসতে পারবেন না। এর ফলে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে ডিগ্রি কিনতে হবে, শিক্ষকতার চাকরি শুধুমাত্র ধনিক শ্রেণীর কুক্ষিগত হবে, শিক্ষা নিয়ে ব্যবসায়ীরা কোটি কোটি টাকার ব্যবসা করবে। এই জনবিরোধী নীতি চালু করার চক্রান্ত রুখতে ২৭ জুলাই এস এস সি পরীক্ষার্থী সংগ্রাম কমিটির উদ্যোগে নদিয়ার কৃষ্ণনগর শহরের পুরসভার মোড়ে পথ অবরোধ করে শিক্ষা সচিবের বিবৃতির প্রতিলিপি পুড়িয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। বিক্ষোভ সভায় সংগঠনের রাজ্য সভাপতি অঞ্জন মুখার্জী বক্তব্য রাখেন।

যুবকদের উদ্যোগে বাওয়ালীতে রক্তদান শিবির

এ আই ডি ওয়াই ও বাওয়ালী শাখা কমিটির উদ্যোগে বিপুল উৎসাহে ২৪ জুলাই রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন করেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নিরঞ্জন নস্কর। শিবিরে এলাকার বিশিষ্ট শিক্ষক নবীনচন্দ্র মণ্ডল, সাংস্কৃতিক কর্মী সুভাষ মণ্ডল ও সংগঠনের কলকাতা জেলা কমিটির সদস্য কমরেড স্মরণিকা করগুপ্ত উপস্থিত ছিলেন। রক্তদাতাদের সহযোগিতা ও যুবকর্মীদের উদ্যোগ খুবই প্রশংসনীয়।

তুফানগঞ্জে অস্থায়ী কৃষিবিদ্যুৎ গ্রাহকরা সিকিউরিটির টাকা ফেরত পেলেন

কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জে কৃষি বিদ্যুৎ গ্রাহকরা অস্থায়ী বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য যে সিকিউরিটির টাকা গচ্ছিত রেখেছিলেন, রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির দপ্তরে দীর্ঘ টালবাহানার পর সেই টাকা ফেরত পেলেন ১৮ জুলাই। ২০১০ সালে ১৪১ জন কৃষি বিদ্যুৎ গ্রাহকের সিকিউরিটির টাকা ফেরতের আবেদনপত্র বিদ্যুৎ দপ্তরের অপদার্থতায় খোয়া যায়। বোরো চাষের সময় সেচের বিদ্যুৎ সংযোগ নেওয়ার জন্য কৃষকরা চড়া সুদে ঋণ নিয়ে সিকিউরিটি হিসাবে ঐ টাকা জমা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। দপ্তরের এহেন দায়িত্বজ্ঞানহীন কাণ্ডের জন্য ঐ কৃষকদের প্রায় ১৯ মাস ধরে ঘুরতে হচ্ছে। বার বার বলা সত্ত্বেও কোনও কাজ না হওয়ায়, কৃষিবিদ্যুৎ গ্রাহকরা অ্যাবেকার নেতৃত্বে আন্দোলনে সামিল হন। সিকিউরিটির টাকা সুদ সমেত ফেরত, গ্রাহকদের হয়রানি বন্ধ, ২৪ ঘণ্টা গ্রাহক পরিষেবা চালু, গ্রুপ সাপ্লাই-এর সামনে গ্রাহকদের জন্য সাইকেল স্ট্যান্ড ও শৌচালয়ের দাবিতে ৩০ জুন গ্রুপ সাপ্লাই অফিস ঘেরাও করা হয়।

২ ঘণ্টার উপর ঘেরাও চলে। অবশেষে গ্রুপ সাপ্লাইয়ের আধিকারিক জেলা দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে ১৫ জুলাই উক্ত ১৪১ জনের সিকিউরিটির টাকা ফেরত দেওয়া হবে বলে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হন এবং অন্যান্য দাবিগুলি বিবেচনা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু টাকা ফেরত না পাওয়ায় স্টেশন ম্যানেজারকে ৫ ঘণ্টা ঘেরাও করা হয়। শেষ পর্যন্ত ১৮ জুলাই ৬৩ জন কৃষক তাঁদের টাকা ফেরত পেয়েছেন, বাকিরা অবিলম্বে ফেরত পাবেন। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন অ্যাবেকার মহকুমা সম্পাদক ভোলা সাহা ও সদস্য উত্তম প্রধান।

১৩ জুলাই অ্যাবেকার জেলা কমিটির পক্ষ থেকে এস ডি সি-এর কালো রেগুলেশন বাতিল ও বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের পদত্যাগের দাবিতে কোচবিহার ডিভিশনের দপ্তরের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালিত হয়। নেতৃত্ব দেন জেলা সভাপতি সমীর গুহ মজুমদার, সম্পাদক কাজল চক্রবর্তী। বক্তব্য রাখেন তাপস চৌধুরী, অনিল দেবশর্মা, স্বপন দাস, ভোলা সাহা, মানিক বর্মণ, নারায়ণ মজুমদার প্রমুখ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃত্বে ২৮ জুলাই বাঁকুড়া জেলা শাসকের কাছে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করলেন নলকূপ সারাই কর্মচারী, আদিবাসী হোস্টেলের কর্মচারী ও ওয়াটার ক্যারিয়ার-সুইপার সহ দেড় শতাধিক স্থায়ী ও অস্থায়ী সরকারি কর্মচারী। অস্থায়ী কর্মচারীদের স্থায়ীকরণ, মূল্যবৃদ্ধি রোধ, বকেয়া বেতন, সুষ্ঠু পদোন্নতির নীতি প্রভৃতি দাবিতে বক্তব্য রাখেন জেলা সভাপতি শৈলেন পাল, সম্পাদক রক্ষাপদ দাস, যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ ঘোষ, খাতড়া মহকুমা সম্পাদক অনিল মণ্ডল প্রমুখ।

সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২২৬০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৪-৫১১৪, ২২২৭-৬২৫৯ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci-c.in
মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।